নিশিগন্ধা

যাবার দিনের আর বেশী বাকি নেই।

মাঠের রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে; বেলা ন'টার পরে কাঁকর খরের পাহাড়ি টিলাগুলির কাছাকাছি আর থাকা যায় না; সকাল বেলাকার হাটে জিনিসপত্রও প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

গত পনেরো দিনের মধ্যে নতুন চেঞ্জার আর একটিও আসেনি এবং আগে যারা কিছুদিন থাকবে ব'লে এখানে এসেছিল, তা'রা একে একে প্রায় সবাই চ'লে গেছে।

কয়েকজন দেহাতী এবং স্থানীয় দোকানদার ছাড়া সমগ্র শিমূলতলাটা এখন প্রায় জনশূন্য। বাগানবাড়ীগুলি প্রেতপুরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মনে করেছিলুম এক মাসের ছুটি—এখানেই শরীরটাকে একটু গুছিয়ে নেবো। কিন্তু খাবার জিনিস এখন কীই বা আছে এখানে?—অবিশ্যি আমার কোনো অসুবিধে নেই! রেলের পাস পাই, যেখানে খুশি গিয়ে ছুটিটা কাটিয়ে দেবো।

পাজামা আর বুশশার্ট-পরা ভদ্রলোকটি ষ্টেশন প্লাটফর্মের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলেন। তাঁর পরিচয়টা ভালো ক'রে জানার জন্য কোনো আগ্রহ যতীনের ছিল না। তবু নতুন মানুষের সঙ্গে নিতান্ত আলাপের খাতিরেই তা'কে প্রশ্ন করতে হোলো, মশাইয়ের কি করা হয়?

লোকটি হাসিমুখে বললে, রাজা এখন নেই, তবু রাজার চাকরি আছে। সেণ্ট্রাল পি-ডবলু-ডি-তে চাকরি করি। তবে কি জানেন, ডিউটিতে

বেরিয়ে দু'দশদিন খুশিমতন বেড়িয়ে বেড়াই। কাজ করি বা ন
দেখছে কে?

যতীন বললে, তবে ত' ভালোই আছেন!

লোকটি প্রশ্ন করলো, মশাইয়ের কোথায় থাকা হয়?

আমি থাকি ওই পূবদিকে মাঠের ধারে 'মণি লজে'। আপনি?

লোকটি সাগ্রহে বললে, মণি লজে? তবে ত' আমার বাছাকা
আপনার ওখান থেকে আসুন এগিয়ে পশ্চিমে! ওই যে লালাদের বাগা
গায়ে রেলিংঘেরা বাড়ীটা,—গোটা দুই ইউক্যালিপটস গাছ সামনে,—
বাড়ীটাই!

যতীনের হাতে বাজারের পুঁটলী ছিল। সে যাবার উদ্যোগ ক'রে বলে
বেশ, তাহ'লে এখন আছেন ত? আবার দেখা হবে!

মশাইয়ের নাম?—লোকটি আবার প্রশ্ন করলো।

যতীন মিত্র। আপনার?

মতিলাল চৌধুরী। আপনি বেড়াতে যান কোন্‌দিকে?

যতীন বললে, সাধারণত ওই ছোট নদীর দিকটাতেই যাই। ওদিকটা
ফাঁকাও বটে, ধুলোও কম। ফেরবার পথে সোজা এসে রেল লাইন!
বিকেলে ওই দিকটাই ভালো। আচ্ছা—

যতীন এক পা এগোতেই লোকটা পুনরায় উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলো,
আপনি থাকবেন কতদিন? মানে, যাবার কি তাড়া আছে?

যতীন এবার হাসলো। বললে ওটা পোষ্টাপিসের ওপর নির্ভর করে।
কলকাতা থেকে মণি অর্ডার আসে আটদিনে,—ভারি অসুবিধেয় আছি।
টেলিগ্রাম করার চেয়ে হেঁটে গিয়ে খবর দিলে তাড়াতাড়ি হয়! আজকাল
সবই ওলোটপালট। আসল কথাটা এই, হাতে টাকা এলে তবে
দিন স্থির করা যায়। আচ্ছা আসি—

লোকটা তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলো, বাজারে পেলেন কিছু ? মাছ, না মাংস ?

কোনোটাই নয় !—যতীন জবাব দিল।

আপনার বুঝি ওসব চলে না ?

চলে, কিন্তু পাচ্ছি কোথায় ?

মতিবাবু এবার একটু উৎসাহিতভাবে বললে, যাক্ আমি বাঁচলুম, মশাই ! আজ ভোর বেলা এক দেহাতী বউ এসে আড়াইসের ছোট মাছ গছিয়ে গেছে। কিন্তু অত মাছ খাবে কে ? যদি কিছু মনে না করেন ত' বলি। আপনাকে কিছু মাছ আমি অফার করতে পারি।

মাছের লোভ সামান্য নয়। যতীন একটু ইতস্তত ক'রে বললো, নেবার অসুবিধে অবিশ্যি কিছু নেই। তবে—কত দাম লাগবে ?

মতিবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, দাম আবার কি মশাই ? চারটি মাছ আপনাকে চার আনায় বেচে আমার কীই হবে ?

যতীন বললে, কিন্তু আপনাকেও ত' দাম দিতে হয়েছে !

হলোই বা ! আপনাকে না হয় উপহারই দিলুম ?—আচ্ছা বেশ, কলকাতা থেকে আপনার মণি অর্ডার এলে না হয় শোধ করবেন !—চলুন !

লোকটা সত্যই মিষ্টভাষী এবং সঙ্গীপ্রিয়। সমস্ত পথটা বলতে বলতে চললো, আপনি বাঙ্গালী,—এসেছেন দেশ ছেড়ে,—আর আমার এটুকু 'ফেলো-ফীলিং' থাকবে না ?—এই ত মশাই কেরোসিন পাচ্ছিনে, চিনি পাচ্ছিনে ! বলুন দেখি চলে কেমন করে ?—না না, থলেটা হাতে ক'রেই আসুন, মাছ নিয়ে একেবারে বাড়ী ঢুকবেন। এতে আর কী হয়েছে, খলে বাবু ...বই নিজেদের মধ্যে। আসুন। বাঙ্গালী চারটি মাছ-ভাত পেলেই ত' নেই ..., তাও যদি না জোটে, তবে চলবে কেমন ক'রে ? আসুন—

সকালের দিকে বড় রাস্তাটা ধরতে হ'লে এই রেলিংঘেরা ব
যতীনকে পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু তা'র ধারণা ছিল আর সব
মতো এ বাড়ীটাও শূন্য। সামনের দরজা জানলা কোনো সময়েই
থাকে না। ফটকে নিয়মমতো বড় একটা তালা ঝোলানো। ম
বললেন, তালার চাবি নিয়ে মালিটা গেছে গাঁয়ে। আসুন এই পাঁ
ফাঁক দিয়ে আমরা ঢুকি। এদিকটা বড়ই নির্জন, আশপাশে
বাগানবাড়ীতে লোকজন নেই। সন্ধ্যার পর ভয়-ভয় করে।

পাঁচিলের ফাটল দিয়ে দুজনে ভিতরে ঢুকে গেল। বাড়ীর ভি
কোথাও বিশেষ সাড়াশব্দ শোনা যাচ্ছে না। সামনের বারান্দায় এ
জঞ্জাল জমেছে যে, এ বাড়ীতে মানুষের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা কঠিন।

ভিতরের সামনের ঘরটা খুব আগোছালো। তীর্থযাত্রীদের ধর্মশা
যেমন পোঁটলা-পুঁটলীর ভিড় হয়, এঘরেও তেমনি। পরিচ্ছন্নতার বা
কোথাও নেই। তবু ওরই মধ্যে একখানা নড়বড়ে তক্তার উপর যতীন
বসতে হোলো। বাজারের থলেটা সে মেঝের উপর নামিয়ে রাখলে
কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছলো।

মতিবাবু বললেন, বসুন যতীনবাবু, আমি এক্ষুণি মাছ এনে দিচ্ছি।-
বেঁচে গেলুম মশাই, সরষের তেলের খরচা কমলো।

হাসতে হাসতে তিনি ভিতরে গেলেন। কিন্তু তিনি অন্দর মহলে
ঢোকার মিনিট দশেকের পর তাঁর বদলে একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে মাথায় ঘোমট
টেনে ঘরে এলো, এবং যতীনকে কোনোপ্রকার প্রস্তুত হবার সময় না দিয়ে
মেঝের উপর মাথা ঠেকিয়ে একটি প্রণাম করলো। বুঝতে বাকি থাকে না
যে, মেয়েটি মতিবাবুর স্ত্রী। কিন্তু বিনা পরিচয়ে এবং বিনা দ্বিধায়
করার এই প্রাচীন ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে যতীন যেন একটু হকচ
সামান্য দুটি মাছ নিতে এসে এমন অন্তরঙ্গতা আর যে-

কলকাতায় যারা মানুষ হয়েছে, তাদের পক্ষে নতুন। যতীনের গলায় একটি আওয়াজও ফুটলো না।

মেয়েটি এবার মাথা তুললো। তারপর নম্র হাসি হেসে বললে, আমাকে চিনতে পেরেছেন? মনে পড়েছে আপনার?

যতীন এবার সোজা তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললে, কই, না?

মেয়েটি বললে, চিনতে নিশ্চয় পেরেছেন, কিন্তু অস্বীকার করছেন। ভালো ক'রে দেখুন ত' মনে পড়ে কি না?

যতীন সবিস্ময়ে বললে, একি কথা, আপনাকে একেবারেই আমি চিনতে পারিনি।

মেয়েটি পুনরায় বললে, ঠিক মনে ক'রে দেখুন। কোথায় দেখেছেন, দেখুন না ভেবে? আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন?

যতীন এবার যেন একটু অস্বস্তিবোধ ক'রে উঠলো। মতিবাবু এ ঘরে এখনও আসছেন না কেন, ভেবে সে একটু আড়ষ্টবোধও করলো। কিন্তু মেয়েটি তার দিকে এমনভাবেই হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে যে, জবাব একটা না দিলেই নয়। একটু সাহস ক'রে সহজ গলায় যতীন এবার বললে, ক্ষমা করবেন, আমার বয়স প্রায় তিরিশ হ'তে চললো। কিন্তু এই বয়সের মধ্যে কোনোকালে কোথাও আপনাকে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না!

মেয়েটির মুখে চোখে লজ্জা ও সঙ্কোচের আভাসমাত্র নেই। বয়স বছর কুড়ির কাছাকাছি হয়ত হবে। চেহারাটা পাঁচজনের মাঝখানে দাঁড় করাবার মতন। কিন্তু আর কোনো কথা না বাড়িয়ে যতীন হঠাৎ বাজারের থলেটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবার আমাকে যেতে হবে। মতিবাবুকে বলবেন, যদি মাছ দেবার অসুবিধে থাকে তবে ব্যস্ত হবার কারণ নেই। সামান্য মাছ বৈ ত' নয়!

অঙ্গার

সকালের দিকে বড় রাস্তাটা ধরতে হ'লে এই রেলিংঘেরা বাড়ীটাই যতীনকে পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু তা'র ধারণা ছিল আর সব বাড়ীর মতো এ বাড়ীটাও শূন্য। সামনের দরজা জানলা কোনো সময়েই খোলা থাকে না। ফটকে নিয়মমতো বড় একটা তালা ঝোলানো। মতিবাবু বললেন, তালার চাবি নিয়ে মালিটা গেছে গাঁয়ে। আসুন এই পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে আমরা ঢুকি। এদিকটা বড়ই নির্জন, আশপাশে কোনো বাগানবাড়ীতে লোকজন নেই। সন্ধ্যার পর ভয়-ভয় করে।

পাঁচিলের ফাটল দিয়ে দুজনে ভিতরে ঢুকে গেল। বাড়ীর ভিতরে কোথাও বিশেষ সাড়াশব্দ শোনা যাচ্ছে না। সামনের বারান্দায় এমনই জঞ্জাল জমেছে যে, এ বাড়ীতে মানুষের অস্তিত্ব বিশ্বাস করা কঠিন।

ভিতরের সামনের ঘরটা খুব আগোছালো। তীর্থযাত্রীদের ধর্মশালায় যেমন পৌটলা-পুঁটলীর ভিড় হয়, এঘরেও তেমনি। পরিচ্ছন্নতার বালাই কোথাও নেই। তবু ওরই মধ্যে একখানা নড়বড়ে তক্তার উপর যতীনকে বসতে হোলো। বাজারের থলেটা সে মেঝের উপর নামিয়ে রাখলো। কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছলো।

মতিবাবু বললেন, বসুন যতীনবাবু, আমি এক্ষুণি মাছ এনে দিচ্ছি।—বেঁচে গেলুম মশাই, সরষের তেলের খরচা কমলো।

হাসতে হাসতে তিনি ভিতরে গেলেন। কিন্তু তিনি অন্দর মহলে ঢোকার মিনিট দশেকের পর তাঁর বদলে একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরে এলো, এবং যতীনকে কোনোপ্রকার প্রস্তুত হবার সময় না দিয়ে মেঝের উপর মাথা ঠেকিয়ে একটি প্রণাম করলো। বুঝতে বাকি থাকে না যে, মেয়েটি মতিবাবুর স্ত্রী। কিন্তু বিনা পরিচয়ে এবং বিনা দ্বিধা[illegible] করার এই প্রাচীন ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে যতীন যেন একটু হকচ[illegible] এস[illegible] সামান্য দুটি মাছ নিতে এসে এমন অন্তরঙ্গতা আর যে-[illegible] খুশী

কলকাতায় যারা মানুষ হয়েছে, তাদের পক্ষে নতুন। যতীনের গলায় একটি আওয়াজও ফুটলো না।

মেয়েটি এবার মাথা তুললো। তারপর নম্র হাসি হেসে বললে, আমাকে চিনতে পেরেছেন? মনে পড়েছে আপনার?

যতীন এবার সোজা তার মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললে, কই, না?

মেয়েটি বললে, চিনতে নিশ্চয় পেরেছেন, কিন্তু অস্বীকার করছেন। ভালো ক'রে দেখুন ত' মনে পড়ে কি না?

যতীন সবিস্ময়ে বললে, একি কথা, আপনাকে একেবারেই আমি চিনতে পারিনি।

মেয়েটি পুনরায় বললে, ঠিক মনে ক'রে দেখুন। কোথায় দেখেছেন, দেখুন না ভেবে? আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন?

যতীন এবার যেন একটু অস্বস্তিবোধ ক'রে উঠলো। মতিবাবু এ ঘরে এখনও আসছেন না কেন, ভেবে সে একটু আড়ষ্টবোধও করলো। কিন্তু মেয়েটি তার দিকে এমনভাবেই হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে যে, জবাব একটা না দিলেই নয়। একটু সাহস ক'রে সহজ গলায় যতীন এবার বললে, ক্ষমা করবেন, আমার বয়স প্রায় তিরিশ হ'তে চললো। কিন্তু এই বয়সের মধ্যে কোনোকালে কোথাও আপনাকে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না!

মেয়েটির মুখে চোখে লজ্জা ও সঙ্কোচের আভাসমাত্র নেই। বয়স বছর কুড়ির কাছাকাছি হয়ত হবে। চেহারাটা পাঁচজনের মাঝখানে দাঁড় করাবার মতন। কিন্তু আর কোনো কথা না বাড়িয়ে যতীন হঠাৎ বাজারের থলেটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, এবার আমাকে যেতে হবে। মতি-বাবুকে বলবেন, যদি মাছ দেবার অসুবিধে থাকে তবে ব্যস্ত হবার কারণ নেই। সামান্য মাছ বৈ ত' নয়!

মেয়েটি বললে, আপনার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে ?

যতীন বললে, আছে বৈকি, আমি গেলে তবে রান্না চড়বে। তা ছাড়া রোদ্দুরও বাড়ছে। আচ্ছা—

কিন্তু আপনার সঙ্গে যে বিশেষ কথা ছিল ?

আমার সঙ্গে ? তবে ডাকুন মতিবাবুকে ?

না না, ওঁর সঙ্গে নয়—!—মেয়েটি যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

যতীন সচকিত হয়ে বললে, তবে ?

মেয়েটি এবার পিছনের দরজার দিকে তাকালো। তারপর একটু চাপাকণ্ঠে বললে, আপনাকে ভালো ক'রে জানি ব'লেই বলছি—ওই উনি আসছেন ! কিন্তু আপনি যেন ওঁকে বলবেন না, আমি কিছু বলছিলুম আপনাকে !

বলতে বলতে মেয়েটি চট্ ক'রে ভিতর দিকে কোথায় চলে গেল। কথাটা বলবার সময় সে যেন হাঁপাচ্ছিল। যতীন অবাক।

উত্তর দিকের দরজা দিয়ে চটি জুতো পায়ে মতিবাবু এঘরে এলেন। হাতে তাঁর একটা মাছের পুঁটলী, তার তলা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছিল। তিনি বললেন, ক্ষমা করবেন, আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। বেশ জ্যান্ত মাছ, ভালোই রান্না হবে। ভারী কষ্ট হোলো আপনার। তা'র ওপর এই রোদ্দুর,—একটু চা খেয়ে যাবেন ?

যতীনের পা দুটো কাঁপছিল। একটু থতিয়ে বললে, আজ্ঞে না,—এবার আমি যাই। আর একদিন না হয় চা খাওয়া যাবে।

মতিবাবু বললেন, পথে-ঘাটে আবার দেখা হবে ত ?

হ্যাঁ, তা হবে বৈকি।—এই ব'লে মাছের পুঁটলীটি থলের ভিতরে পুরে নিয়ে যতীন পা বাড়ালো।

মতিবাবু সহাস্যে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হ ভারী খুশী হলুম।

বাইরে এসে যতীনকে আগেকার মতন পাঁচিলের ফাটলে পা বাড়িয়ে ডিঙ্গিয়ে আসতে হোলো। কিন্তু পিছন দিকে ফিরে তাকাবার সাহস তা'র আর হোলো না। সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করতে তা'র সময় লাগবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ সকালের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে অত্যন্ত রহস্যজনক এবং অবিশ্বাস্য এইটিই তা'র বার বার মনে হচ্ছিল। মেয়েটিকে কখনও কোথাও সে দেখেছে একথা ভালো ক'রে ভেবে দেখবারও তা'র ধৈর্য নেই, কেন না এ মেয়েকে এ জীবনে কখনই সে দেখেনি; আলাপ হওয়া ত' দূরের কথা। ব্যাপারটা কেবল যে জটিল তাই নয়, যেন এর পিছনে একটা কোনো ষড়যন্ত্র আছে—এমন সন্দেহও আসে মনে। লোকশূন্য শিমূলতলা তা'র চোখে রহস্যময় হয়ে ওঠে।

অনেকদূর এসে পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে যতীন মাছের পুঁটলীটা ফস ক'রে একবার খুললো। সত্যই মাছগুলো ঠিক আছে, নিতান্ত ভোজবাজি নয়; এবং মাছগুলো টাট্‌কাও বটে। কিন্তু মাথার উপর প্রখর রৌদ্রের তাপে ভালো ক'রে কিছু ভাবতে গেলে গুলিয়ে যায়। যতীন আবার চলতে লাগলো তা'র বাড়ীর দিকে।

মণি অর্ডারের বদলে চিঠি এসেছে। অবশ্য চিঠিতে এই কথাটাই আছে যে, মণি অর্ডার শীঘ্রই যাচ্ছে। সুতরাং যতীনের দুশ্চিন্তার কিছু নেই। হাতে টাকাকড়ি যা আছে তা'তে এখনও হয়ত কোনোমতে সপ্তাহখানেক চলে যেতে পারবে। যদি কিছু ধার-বাকি পড়ে, তা'হলেও অসুবিধে নেই। দোকানে বাজারে সে বেশ পরিচিত।

কিন্তু অন্যদিকের কথা হোলো, শিমূলতলায় থাকার উৎসাহ আর কারো নেই। আশ্বিনের শেষ থেকে যে সজীবতাটা আসে, চৈত্রের শেষ দিকে এলে সেটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। তা' ছাড়া নিত্যদিনকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা বড়ই দুরূহ হয়ে ওঠে। ব'সে ব'সে তখন যাবার দিন গুণতে হয়।

একই পথ, একই পল্লী এবং প্রত্যহের একই কর্মসূচী—বৈচিত্র্য কোথাও কিছু নেই। যতীন যেদিন পায়ের জোর পায় সেদিন যায় মাঠ পেরিয়ে মঠের দিকে, কিংবা ঝাঝার পথে, কিংবা আরণ্যক সাঁওতাল পল্লীর সেই টিলা পাহাড়ের পথের দিকে। অদূরে পাহাড়, কিন্তু পাহাড়তলীর নীচের দিকে অতি ক্ষীণ ধারায় বয়ে চলেছে নামহারা দিকহারা নদী,—সেখানে কখনো হয় মৃতের সৎকার, কখনো বা ধোবারা কাপড় কাচতে আসে। সেখান থেকে ঘুরে স্টেশনের দিকে যেতে খানিকটা সময় লাগে। পথটা প্রতিদিনই প্রায় জনহীন,—আর সেই ডাঙ্গামাঠের চারদিক থেকে নিশ্বাস রোধ-করা ধূসর সন্ধ্যা ছমছমিয়ে নেমে আসে। যতীন একটু পা চালিয়েই হাঁটতে থাকে।

হঠাৎ একদিন পিছন থেকে ডাক শোনে,—শুনুন?

যতীন চমকে ওঠে। ছাঁৎ ক'রে ওঠে তা'র মন। এ সেই কণ্ঠস্বর। মেয়েটি অতি দ্রুত পিছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। যতীন গলাটা ঝেড়ে একটু সহজ ক'রে বলে, এই যে, ভালো আছেন?

মেয়েটি রুদ্ধশ্বাসে বলে, কানে বুঝি আপনি শুনতে পান না? কতদূর থেকে গলা ফাটিয়ে ডাকছি আপনাকে! এক মাইল পথ ত' আপনার পেছনে ছুটতে-ছুটতেই এলুম। আপনি বড্ড অন্যমনস্ক হাঁটেন।

যতীনের গা যেন ভারী হয়ে আসে। আড়ষ্ট কণ্ঠে সে জবাব দেয়, আজ একটু দেরিই হয়ে গেছে। অন্যদিন এর আগেই ফিরে যাই! এদিকটা খুবই নিরিবিলি।

মেয়েটি এবার বললে, সেইজন্যেই চেনা মানুষকে পেলে এসব রাস্তায় একটু সাহস বাড়ে। এই বিদেশ-বিভুঁই!

যতীন সেদিনকার সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠেছে এই কয়দিনে। সে প্রস্তুত হয়েই ছিল। মেয়েটির কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বললে, আপনাকে কিন্তু আমি একেবারেই চিনিনে।

চেনা অবিশ্যি কঠিন, মেয়েটি বললে, কিন্তু চেনা হয়ও এক মিনিটে। অনেকদিন ধ'রে পথেঘাটে আপনাকে আমি দেখেছি, অথচ আপনি-যে আমাকে দেখেননি, এই আশ্চর্য।

যতীন এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। বললে, হ্যাঁ, তা হ'তে পারে! আমি অবিশ্যি লক্ষ্য করিনি।—কিন্তু আপনার স্বামী মতিবাবু কই? পেছনে ফেলে এসেছেন বুঝি?

মেয়েটি এবার পিছন ফিরে তাকালো। পরে বললে, ছুটতে ছুটতে এসেছি কিনা,—আসুন তবে, এখানে একটু দাঁড়াই।

মাঠের পথের দুই পাশে অপেক্ষা করার মতো জায়গা কোথাও নেই। তা ছাড়া প্রান্তরের উপরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দূরে দূরে অস্পষ্ট যে কয়খানা ছবির মতো বাড়ী দেখা যায় সেখানে কোথাও সন্ধ্যার আলো জ্বলেনি। সমগ্র শিমূলতলার চক্ষু যেন তমিস্র-নিদ্রায় বুজে আসছিল। একটি চপল মুখর মেয়ের সঙ্গে একান্তে এইভাবে অপেক্ষা করাটা যতীনের পক্ষে অনেকখানি সঙ্কোচের কারণ এতে সন্দেহ কি। কিন্তু পথের ধারে এইভাবে একটি বয়স্থা তরুণীর সঙ্গে মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকতেও বাধো-বাধো ঠেকে।

একসময় যতীন বললে, মতিবাবু ছাড়া আপনাদের ওখানে আর কে-কে আছেন?

আমার মা, আর আছে একটি ছোট ভাই।

কতদিন আছেন এখানে?

তা প্রায় দেড়মাস হ'তে চললো!

যতীন প্রশ্ন করলো, ওটা কি আপনাদের নিজের বাড়ী?

মেয়েটি এবার খুব হেসে উঠলো। সে-হাসি ছুটে গেল দুইধারের পথের অনেক দূর পর্যন্ত। হাসি থামবার পর সে বললে, এখানে বোকারা বাড়ী

তৈরী করে, আর চালাক লোকরা সেই বাড়ীতে এসে বাস করে। ও-বাড়ীতে আমরা এমনিই থাকি।

যতীন চুপ ক'রে গেল। আবার তাকে একটা নতুন বিষয় অবতারণা করতে হয়, নচেৎ কথালাপের সূত্রটা ধরে রাখা যায় না। হঠাৎ তরুণীটিই কথার সূত্র ধরে বললে, আপনি যেরকম কম কথা বলেন, আপনাকে কিছু বলতেও আমার সাহস হয় না!

যতীন বললে, আপনি কি কিছু বলতে চান্?

হ্যাঁ।

কি বলতে চান বলুন?

মেয়েটি মুখ তুলে তাকালো। তারপর সহাস্যে বললে, এমন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলে মেয়েমানুষের মুখে কি কথা ফোটে? আসুন, এখানে একটু বসি।

মতিবাবু এসে পড়বেন শীঘ্রই এই পথেই। কিন্তু এভাবে এই ঘোলাটে অন্ধকারে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পাশাপাশি ব'সে নিরিবিলি আলাপ করাটা স্বামীর চক্ষে দৃষ্টিকটু হবে কিনা, এই কথা মনে ক'রে যতীন একটু ইতস্তত করলো। কিন্তু মেয়েটি আগেভাগেই গুছিয়ে ব'সে প'ড়ে বললে, কই বসলেন না?

অপরাধের চেতনা থেকেই কুণ্ঠা আসে। যতীন সেই কুণ্ঠা কাটিয়ে ব'সে পড়লো। তারপর বললে, কতদূরে ওঁদের ফেলে এসেছেন? এখনো এলেন না যে?

আমার চেয়ে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি কি আমার কথাটা শুনতে চান্ না?

চাই বৈ কি। কিন্তু কথাটা মতিবাবুর সামনে হ'লে ভালো হোত না?

মেয়েটি অনুযোগ ক'রে বললে, তাঁর সামনেই যদি বলবো তবে আপনাকে ধরবার জন্যে ছুটতে ছুটতে এতদূর এলুম কেন?

যতীন সবিস্ময়ে বললে, এমন কী কথা আপনার, যা তাঁর আড়ালে বলতে হবে ?

মেয়েটি যেন এবার একটু উত্তেজিত হোলো। বললে, 'এমন কথাও থাকতে পারে যা তাঁর আড়ালে না বললে বলাও যায় না।'

যতীন চুপ করে গেল, কিন্তু তার গা ছমছমিয়ে এলো। মেয়েটি পুনরায় বললে, জানেন, কতদিন ধ'রে একথাটা আপনাকে বলবার জন্যে চেষ্টা করছি ? ষ্টেশনের ওপরে আপনি গেছেন, আমি দেখেছি, কাছে গিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি—কিন্তু পারিনি। আপনি পাহাড় পেরিয়ে গেছেন রামকৃষ্ণ আশ্রমের দিকে, আপনার পেছনে পেছনে গেছি—কিন্তু বলা হয়ে ওঠেনি। আপনি 'মাধবী-ভিলার' বাগানে ঢুকেছেন, আমিও ঢুকেছি,—এগিয়ে গেছি ঠিক পাশে,—কথাটা মুখে এসেছে, কিন্তু সাহস হয়নি! আপনি সেদিন গয়লাদের ঘরে ঢুকেছিলেন, কিন্তু টের পেয়েছিলেন কি, কে আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে ? ষ্টেশন পেরিয়ে গিয়ে সেই যে কেরোসিনের দোকান,—আপনি সেখানে গিয়ে সেদিন তেল কিনছেন, কিন্তু আমি ছিলুম আপনার কাঁধের ঠিক পাশে, আপনি লক্ষ্য করেন নি। একজন মেয়েছেলে তা'র সমস্ত লজ্জাসরম ছেড়ে ছায়ার মতন আপনার আশেপাশে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আপনার নিষ্ঠুর চোখ সেদিকে একবারও পড়েনি !

মেয়েটির চোখ দুটো ঠিক দেখা গেল না, কিন্তু মনে হোলো—গলাটা তা'র বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। যতীন যেন অনেকটা মূঢ়ের মতো একদিকে তাকিয়ে রইলো।

কণ্ঠস্বর একটু সহজ ক'রে অতঃপর মেয়েটি বলল, আপনার সঙ্গে এত আলাপ হোলো, কিন্তু কই, এ পর্যন্ত আপনি আমার নামটাও জানতে চাইলেন না যে ?

যতীন বললে, আপনাকে মিসেস চৌধুরী বলেই মনে করি।

ওটা পরিচয়, কিন্তু নাম নয়। আমার নাম ভাস্বতী!

যতীন আবার চুপ করে গেল। ভাস্বতী বললে, মেয়েদের ওপর খুব ঘেন্না বুঝি আপনার?

ব্যস্ত হয়ে যতীন বললে, একথা আসে কেন? আপনাকে আমি ত' কিছু বলিনি?—কিন্তু আর বোধ হয় অপেক্ষা করা চলে না! তাঁরা হয়ত অন্য পথ দিয়ে ফিরে থাকবেন।

. ভাস্বতী বললে, আপনার যদি ভয় করে আমি গিয়ে না হয় পৌঁছে দিয়ে আসবো! তা ছাড়া আমাকে ভয় করবার ত' কিছু নেই।

যতীন বললে, আপনার বক্তব্য এবার বলুন?

ভাস্বতী একবার এদিক ওদিক তাকালো। পাহাড়তলীর চারদি[illegible] প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। জনশূন্য বিস্তৃত প্রান্তরে কোথাও কোনো [illegible]তনার চিহ্নমাত্র নেই। দূরে পাহাড়ের গায়ে আগুন লেগেছে,—শেষ বসন্তে [illegible]যমন পাহাড়ে-পাহাড়ে আগুন লাগে। ভাস্বতীর গলায় একটু কাঁপন লাগ[illegible]া। কিন্তু যথাসম্ভব নিজেকে সংযত ক'রে সে বললে, আগেই বলে [illegible], কথাটা শুনে যদি আপনি মুখ ফিরিয়ে চলে যান তাহ'লে আমার পক্ষে [illegible]ন্ত অপমান হবে। আগে কথা দিন? বলুন, আমি বিমুখ হবো না?

যতীন বললে, কী কথা আপনার? কী কথা দেবো আপনাকে?

বলুন যে রাগ করবেন না? বলুন যে, রাগ করে আমাকে লজ্জা দেবেন না?

রাগ যদি বা করি প্রকাশ করবো কেন? তা'ছাড়া আপনি ভদ্রঘরের মেয়ে, একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী,—আপনার সম্মান, আপনার সামাজিক পরিচয়। আমার কিছু দায়িত্ববোধ আছে বৈকি। বলুন আপনি, কি বলবার আছে?—যতীন একটু অধীর হোলো।

ভাস্বতী আবার একবার তাকিয়ে নিল এদিক ওদিক। পরে বললে, কেউ কোথাও নেই! কেউ শুনবেও না, জানবেও না। আপনি যদি আমাকে অপমান ক'রেও যান্ তাহলে এমন সাক্ষীও কেউ থাকবে না! নিন্দেও কিছু রটবে না! একবার আপনি ভালো করে সমস্তটা ভেবে দেখুন ত? এই যে একলা আপনার পাশে অন্ধকারে বসে আছি, এ কেন? আপনি কি দেখেছেন আমার কোনো ভয়-ডর আছে? কেন নেই? কে আমাকে এমন সাহস যোগালে? আপনার পেছনে পেছনে এতদিন কেন ঘুরে বেড়াচ্ছি? এমন কিছু কথা নিশ্চয় আছে আমার, যার জন্যে প্রাণের দায়ে আপনাকে এসে ধরেছি?

যতীন হতবুদ্ধির মতো বললে, প্রাণের দায়ে! মানে?

ভাস্বতীর গুরু গুরু নিশ্বাসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। তার মাথার খোঁপায় এক গোছা ফুল গোঁজা রয়েছে, মাথায় তার কাপড় নেই। স্বামীর যে আসতে দেরী হচ্ছে, কিংবা স্বামী যে তার জন্য কোথাও অপেক্ষা করতে পারে, এ সম্বন্ধে তার কিছুমাত্র উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে না। এমন ভাবেই সে এই মাঠের ধারে গুছিয়ে বসেছে যে, দু-চার ঘণ্টা গল্প করে কাটাতেও তার আপত্তি নেই।

এবার সে বললে, দেখুন, এ দেশ আপনারও নয়, আমারও নয়। কলকাতায় আমরা যেমন থাকি এখানে কি সেইভাবে আছি? কত বাঁধন থাকে সেখানে, কত লোকের মুখ চেয়ে থাকা, কতজনকে খুশী করে চলা। সেখানে কত শাসন, কত ভয় আর চক্ষুলজ্জা, ভালোমন্দের কত বিচার, পাড়াপল্লীর কত গোয়েন্দাগিরি—কিন্তু এখানে? এখানে কিচ্ছু নেই! সব খিল যেন খুলে গেছে! কেউ দেখবে না, জানবে না, শুনবে না!

দীর্ঘবিলম্বিত আলাপের মাঝখানে যতীন হঠাৎ ছেদ টানলো। নিজেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দেখুন, কথায় কথা বেড়ে চলেছে, কিন্তু আজকে

আর নয়। যেটা বুঝতে পাচ্ছিনে সেটা আজ বোঝবার চেষ্টাও করবো না। এবার আমাকে যেতে দিন।

ভাস্বতীও উঠে দাঁড়ালো। বললে, আপনি শুনবেন না?

আজ আপনার কাছে ছুটি চাইছি।

কোথা যাবেন এখন?—মেয়েটা যেন অস্থির হয়ে উঠলো।

যতীন বললে, এবার ফিরবো। রাত হয়েছে!

ভাস্বতী বললে, কিন্তু আমার কথা না শুনলে চলবে না যে!

বেশ ত, কাল সকালেই না হয় শোনা যাবে?

অধীরকণ্ঠে ভাস্বতী বললে, কিন্তু দিনের আলো থাকতে সে-কথা যে আপনাকে বলতে পারবো না! আমি যে চাই অন্ধকার, নিরিবিলি মাঠ, কেউ কোথাও থাকবে না! আমার মুখ আপনি ঠাহর করতে পারবেন না,—ঠিক এমনি অন্ধকারে আপনাকে বলতে চাই। শুনুন,—দাঁড়ান একটু—চ'লে যাবেন না—

কয়েক পা অগ্রসর হয়ে যতীন আবার দাঁড়ালো। ভাস্বতী এগিয়ে এসে বললে, অমনি করে আপনাকে চলে যেতে দেবো না, আপনাকে এমন করে ছাড়তেও পারবো না। এ আমার প্রাণের দায়, আপনাকে আগেই বলেছি আমাকে পায়ে ঠেলবেন না—

যতীন এবার একটু কঠোর কণ্ঠে বললে, দেখুন, আপনার সম্বন্ধে এবার আমার সন্দেহ হচ্ছে! এমন করে মান খোয়াবেন না!

সন্দেহ করুন, কিন্তু এমন ক'রে পায়ে ঠেলে যাবেন না। এতদিনের এত আশা, এ যেন আমার মিথ্যে না হয়!—বলতে বলতে সামনে দাঁড়িয়ে আবেগে আর উত্তেজনায় ভাস্বতী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। কান্নাটা আকুল, ভয়ব্যাকুল।

যতীন বললে, আপনি কি চান্? কি চান্ স্পষ্ট বলুন।

তৎক্ষণাৎ ভাস্বতী বললে, আপনার দয়া, একটু স্নেহ, একটুখানি বিবেচনা! আপনি ছাড়া আর আমার কেউ নেই!

অবাক করলেন আপনি! স্বামীকে ছেড়ে একলা মাঠে অন্ধকারে একজন অচেনা লোকের সামনে কান্নাকাটি ক'রে এসব জিনিস চাওয়ার মানে বোঝেন?—যতীন যেন তা'কে ধমক দিল।

বুঝি!—ভাস্বতী অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললে, বুঝি ব'লেই চাচ্ছি এসব। আপনাকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেতে দেবো না বলেই একলা এসেছি। আপনি যেখানেই যান্, আমাকেও যেতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। কিছুতেই আপনাকে ছাড়তে পারবো না!

তবে চলুন।—বলে যতীন অগ্রসর হোলো।

যতীন আগে আগে, ভাস্বতী তার পিছনে। দুজনে এবার মুখ বুজে প্রায় পনেরো মিনিটকাল ধরে পথ হাঁটতে লাগলো। আকাশে তৃতীয়ার শীর্ণ চাঁদ ছিল, কিন্তু সে-আলোয় পথ কিছুই দেখা যায় না। কেবল সামনে বহুদূর অবধি একটা ধূলিধূসরতার দাগ পড়েছিল। সেই দাগ ধ'রে যতীন হন হন ক'রে চলতে লাগলো। তা'র দ্রুত চলার সঙ্গে দ্রুততর গতিতে ভাস্বতীও এগিয়ে চললো।

অন্ধকারে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে যতীন বললে, এই ত' আপনাদের বাড়ী! আচ্ছা, আমি যাই,—নমস্কার।

না না, সে হবে না,—চট ক'রে এগিয়ে এসে ভাস্বতী পথ আগলে দাঁড়ালো। বললে, আপনাকে ভেতরে যেতে হবে!

ভেতরে যাবো, কিন্তু রাত হয়ে গেছে যে।

তা হোক,—চলুন। সেদিন আপনার চা খাওয়া হয়নি!

অগত্যা সেই ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাটল পেরিয়ে অন্ধকারে যতীনকে ভিতরে আসতে হোলো। ভিতরটা নিস্তব্ধ, কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

বারান্দায় উঠে এসে যতীন কি মনে ক'রে একবার স্থির হ... দাঁড়ালো। তারপর বললে, আমার সঙ্গে আপনি এই রাত্রে ফিরলেন, ... আপনার স্বামী কিছু মনে করবেন না?

ভাস্বতী অন্ধকারেই দাঁড়ালো। সোজা যতীনের মুখের দি... অপলক-চক্ষে তাকিয়ে বললে, যে কথা আপনি কিছুতেই শুনতে চাইলেন ... সেকথা কি এইখানে দাঁড়িয়ে শুনতে চান্?

যতীন বললে, না, আপনার স্বামীর সামনেই শুনবো।

স্বামী! স্বামী কে? স্বামী ত' আমার নেই!

মানে?—যতীন বজ্রাহতের মতো একটা ধাক্কা সামলে নিল।

ভাস্বতী বললে, আমার কি বিয়ে হয়েছে যে, স্বামী থাকবে?

কার জন্যে তবে আপনি রাস্তায় অতক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা করছিলেন?

কারো জন্যেই নয়। আপনার পিছনে পিছনেই আসছিলুম।

যতীন বললে, মতিবাবু তবে কে আপনাদের?

মতিবাবু ব'লে কোনো লোকই ছিল না। ও লোকটার নাম মোহিত-বাবু। লোকটা শয়তান, জোচ্চোর। আজ দুদিন আগে আমাদের ...থে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে। লোকটা পথে আমাদের সঙ্গে আল... ক'রে ঘরে এসে ঢুকেছিল।

মানে?—যতীন আবার বললে, আপনারা কি যাদুবিদ্যা জানেন? এত বড় কথাটা চেপে রেখেছিলেন?

সহসা ভাস্বতী সেইখানেই ব'সে প'ড়ে আবার কেঁদে ফেললো। বললে, আমাকে বাঁচান্, আমাকে রক্ষে করুন, আমি আপনার পায়ে পড়ি—!

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যতীন কাঠ হ'য়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ভাস্বতী বললে, ভেতরে আমার রুগ্ন মা, আর

ছোট ভাই। আমাদের আর কোনো উপায় নেই! আমাদের দিন চলছে না, আপনি আমাদের বাঁচান্!

শিমুলতলায় এসেছেন কেন?—যতীন জানতে চাইলো।

ভাস্বতী বললে, এসেছি অনেকদিন।

শুনতুম, এখানে বড়লোকেরা আসে। এখানে নাকি মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে ভিক্ষে করা চলে।—ঝরঝরিয়ে পায়ের কাছে পড়ে সে কাঁদতে লাগলো।

যতীন বললে, মোহিতবাবুকে এতদিন এ বাড়ীতে রেখেছিলেন কেন?

ও লোকটা সাহায্য করতে এসে সর্বনাশের চেষ্টায় ছিল। ও আমাদের কেউ নয়। মাঝে মাঝে দু এক টাকা দিত।

কিন্তু হঠাৎ পালালো কেন?

ভাস্বতী জবাব দিল না, আগেকার মতোই ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। তারপর এক সময় বললে, মা সেরে উঠলে ঝি-গিরি করতে পারবেন, কিন্তু ভাইটিকে মানুষ করতে না পারলে আমাদের আর কোনো উপায় নেই। আপনি আমাদের কিছু ভিক্ষে দিন্। আমাদের বাঁচান্। আজ দুদিন আমাদের রান্না চড়েনি!

যতীন অনেকক্ষণ ধ'রে কি ভেবে এক সময়ে পকেটে হাত দিল। তারপর বললে, আজ আমার মণিঅর্ডার এসেছিল, পোষ্ট আপিস থেকে টাকা নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। অবিশ্যি এ আমার দেশে ফেরবার খরচ। তা হোক, এ আপনি নিন্।

প্রায় শ'খানেক টাকা হবে। ভাস্বতী হাত পেতে সেই টাকা নিল। তখনো তা'র চোখে জল ঝরছে। যতীন বললে, আমি আর ভেতরে যাবো না। এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা ব'লে যাই, এ-পথ আপনাদের ঠিক পথ নয়।—

যতীন অন্ধকারে বেরিয়ে চলে গেল!

গন্ধ

রোগী দেখার জন্য এ বাড়ীতে ডাক্তারবদ্যিরা আসে, কিন্তু যে-ব্যক্তি রোগীর সেবা ও পরিচর্যা করে, তা'কে দেখবার জন্য আসে এপাড়া ওপাড়ার মেয়েরা। এমন কি এ বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে যে-সকল মুখচেনা ভদ্রলোকরা আনাগোনা করেন তাঁরাও উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চ'লে যান্—যদি কোনও সময়ে হঠাৎ শুশ্রূষাকারিণীর দর্শন মিলে যায়।

পাড়ার মেয়েরা বলে, এমন দেখিনি! অনেক পুণ্যে লোকটা এমন স্ত্রী পেয়েছিল। পাঁচ বছর ধ'রে স্বামীর মাথার পাশে ব'সে রাত জাগছে, একটি দিনও ঘুমোয়নি—এ ঘটনা কি না দেখলে বিশ্বাস করতো কেউ?

কেউ বা ওরই মধ্যে একটু ব্যঙ্গাত্মক হাসি মিলিয়ে বলে, আদর্শ হিন্দু স্ত্রী।

এমনি বিলেত ফেরতা ডাক্তার ভৌমিকও সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন, স্বামীর প্রতি অন্ধ ভালোবাসা দেখে এসেছি লণ্ডনের কোনো কোনো পরিবারে, কিন্তু রুগ্ন স্বামীর মাথার পাশে পনেরো রাত্রি ধ'রে কোনো মেয়ে ব'সে থেকেছে—এ কথা শুনলে তারাও বিশ্বাস করবে না। এ কেবল ইণ্ডিয়াতেই সম্ভব। আপনি কি সত্যিই রাত্রে ঘুমোন না, মিসেস রায়?

শিবানীর মুখে চোখে চিন্তাবৈলক্ষণ্যের রেখা মাত্র দেখা গেল না। তিনি বললেন, সময় পেলে ঘুমোতুম বৈ কি।

পনেরো বছরের মেয়েটি আজ প্রায় পাঁচ মাস শয্যাগত; বারো বছরের ছেলেটি আশৈশব মৃগী রোগে ভুগছে। পারিবারিক অবস্থাটা সচ্ছল।

বাড়ীতে ঠাকুর চাকর ঝি—সবাই আছে। ওরা থাকে ঘরসংসার নিয়ে, শিবানী থাকেন রোগীদের নিয়ে। বাড়ীর ভিতরের চারিদিকে অদ্ভুত রোগের চক্রান্ত,—বিচিত্র এবং বিভিন্ন ঔষধের সংমিশ্রিত কড়া গন্ধ দিবারাত্র বাড়ীর মধ্যে ভেসে বেড়ায়,—এবং এই সকল দুরারোগ্য ব্যাধির একটা নিত্যনৈমিত্তিক ষড়যন্ত্র প্রায় পাঁচ বছর থেকে শিবানীকে স্থির থাকতে দেয়নি। ওই কটু ও কঠিন গন্ধটাই ওঁকে সক্রিয় ক'রে রাখে।

সেদিন পাড়ার একটি মহিলা প্রশ্ন করছিলেন, আপনার স্বামীর হাতে অতখানি সুতো বাঁধা কেন, বৌদিদি ?

আসছি।—ব'লে শিবানী স্বামীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। টেবলের ওপর থেকে ওষুধ এক দাগ নিয়ে স্বামীর মুখে ঢেলে দিলেন, পরে কাচের পাত্র থেকে চারটি বেদানার দানা নিয়ে রোগীকে খাওয়ালেন। উচ্ছিষ্টের পাত্রটা ধরলেন মুখের কাছে। কাজ সেরে আবার বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এসে সেই মহিলার দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁ, ওগুলো সুতো। বাবা তারকনাথের তাগা।

কবে পরালেন ?

দু'বছর আগে।

মহিলা প্রশ্ন করলেন, আপনাদের বিশ্বাস আছে বুঝি ?

রেখাহীন নির্বিকার মুখে শিবানী বললেন, তারকনাথে গিয়ে আমি ধর্ণা দিয়েছিলুম। তিনদিন পরে ওষুধ পাই আঁচলে। সেই ওষুধ ওঁর গলায় ঝোলানো।

আপনার মেয়ের গলার কবচখানাও বুঝি তাই ?

না, ওটা শুদ্ধিবাবার কবচ। হাতে সিদ্ধেশ্বরীর মাদুলী।—শিবানী চ'লে গেলেন অন্য ঘরে।

সেদিন বত্রিশটি টাকা পকেটে পুরে ডাক্তার ভৌমিক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

রোগীর সামনেই শিবানী বললেন, ডাক্তারবাবু, আপনার হাতে রোজ দিতে আমি লজ্জা পাই। এক কাজ করুন, এই টানায় আমার টাকা আছে, আপনি এর থেকে আপনার ফী গুণে নিয়ে যাবেন রোজ।

মুখের চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে কিছুমাত্র উত্তাপ নেই, যেন কলের পুতুল কথা কইলো। যে আজ্ঞে—ব'লে ডাক্তার চ'লে গেলেন। এমন সময় বারান্দার পূবদিকের দালানে শোনা গেল মসমসে জুতোর আওয়াজ। বুঝতে পারা গেল কন্যার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। ভদ্রলোকের বয়স কম, চোখে চশমা, কোটপ্যাণ্ট পরা,—মাথায় মস্ত টাক। ওই ধার থেকেই হঠাৎ এলো কড়া ফিনাইলের গন্ধ। বাড়ী এতক্ষণে ফিনাইল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে।

স্বামীর ঘরে এলেন শিবানী। বেলা ঠিক সাড়ে ন'টা ঘড়িতে। গরম জলে তোয়ালে ডুবিয়ে নিংড়ে স্বামীর মাথা ও গা মুছিয়ে দিলো। স্বামী যেন কী বলছিলেন বিজ বিজ ক'রে—কিন্তু শিবানী নিজের মনে কাজ ক'রে গেলেন। রোগীর মুখে পথ্য দিয়ে এক সময়ে তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, মালী ?

চাকর এসে দাঁড়ালো। শিবানী বললেন, দিদিমণির ঘরে দুধ দা

মালী চলে গেল। একটা ছোট শিশির ছিপি খুলে শিবানী একবার স্বামীর নাকের কাছে ধরলেন, তারপর শিশিটি যথাস্থানে আবার রেখে তিনি বেরিয়ে এলেন। গন্ধটা শোঁকানো দরকার।

বারান্দা পেরিয়ে শিবানী কোণের ঘরে এসে ঢুকলেন। সামনে যে-দৃশ্য দেখা গেল, সন্তানের জননী ছাড়া আর যে-কেউ দেখলে শিউরে উঠতো। ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে একতাল মাংসপিণ্ডের মতো বেঁকেচুরে পড়ে রয়েছে। বাঁকা পা দুটো ঢুকেছে পেটের মধ্যে, বাঁকা মুখের পাশ দিয়ে চোখ দুটো নাকের পাশে কোথায় হারিয়ে গেছে। ছেলেটা অজ্ঞান

হয়ে রয়েছে দেখে শিবানী কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। তারপর তাকের উপর থেকে সর্ষের তেলের বাটি নিয়ে এসে সেই অচেতন ছেলেটাকে তেল মাখাতে বসে গেলেন। চাকর এক বালতি জল দিয়ে গেল, ঝি এনে দিল গামছা আর সাবান। শিবানী নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মে ছেলেটাকে স্নান করাতে বসে গেলেন। মৃগীবিকার সারবে একটু বাদে— শিবানী জানেন। অতএব তাকে স্নান করিয়ে সেই কদাকার বিকারের মধ্যে রেখে তিনি গেলেন কন্যার ঘরে। হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ততক্ষণে চলে গেছেন। শিবানী গিয়ে দুধের গেলাসটা ধরলেন মেয়ের মুখে। তিনি হলেন যন্ত্র। তাঁর ক্রিয়া আছে, চালনা আছে, উদ্যমও আছে। তাঁর ক্লান্তি নেই, অবসাদও নেই।

বাইরে কার গলার আওয়াজে তিনি একসময়ে আবার বেরিয়ে এলেন। একটি ছোকরাকে দেখে বললেন, কি রে দেবেন?

দেবেন বললে, কবিরাজমশাই এই ওষুধগুলো পাঠালেন। এর মধ্যেই নিয়ম আর অনুপানের ফর্দ আছে, পিসিমা। আর শুনুন, আপনার ছোড়দার ওখানে গিয়েছিলুম।

শিবানী তার দিকে তাকালেন। দেবেন বললে, তাঁর স্ত্রীর অবস্থা খুব খারাপ। বোধ হয় বাঁচবেন না।

হ্যাঁ জানি। বলে কবিরাজী ওষুধের মস্ত মোড়কটা তুলে নিয়ে শিবানী ভিতরে চলে গেলেন। তাঁর কণ্ঠে কাঁপন নেই, ব্যথা-বেদনা অথবা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। দেবেন তাঁর পথের দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেল।

ঘড়ির দিকে একসময় তাকিয়ে শিবানী গেলেন রান্নাঘরে। সেখান থেকে কাচের প্লেটে ভাত আর সিদ্ধ তরকারি নিয়ে এলেন কোণের ঘরে ছেলেটার কাছে। খাদ্যের চেহারা দেখে শৃঙ্খলাবদ্ধ জন্তুর মতো বিকলাঙ্গ ছেলেটা

আনন্দে কিলবিল করে উঠলো। শিবানী তাকে খাওয়াতে বসে গেলেন। পোড়াকাঠের মতো কালো জন্তুটা।

কিন্তু মেয়েটা তেমন নয়। এই সেদিন পর্যন্ত মেয়েটা ছিল সুশ্রী। পনেরো বছর বয়সে সবেমাত্র সর্বাঙ্গে তারুণ্যের নধর সুকুমার ছন্দ এসে পৌঁছেছিল, এমন সময়ে এলো জ্বর। দেখতে দেখতে চোখের কোণে কালি, দেখতে দেখতে মাথার চুলের রাশি বিবর্ণ—মেয়েটা ইস্কুল থেকে ছুটি নিয়ে এসে বিছানা নিল। পাঁচ মাস হোলো শুয়েই আছে। বিছানাটা যদি আর না ছাড়ে তবে বিস্ময়ের কারণ নেই।

'পাশের বাড়ীর গিন্নী বলেন, বোঝা সয়, যে বোঝা বয়! কী ধৈর্য, আমরা অবাক হয়ে যাই। মুখে একটি কথা নেই সারাদিন। একালে এমন মেয়ে দেখা যায় না কোথাও! পাঁচ বছর হোলো, মা!

আরেক জন বল্লেন, পাঁচ বছর হোলো ওই চারখানা ঘরের মধ্যে শিবানী ঘুরছে। আমরা কত বলি বাছা বিকেলের দিকে ছাদে উঠেও ত' একটু নিশ্বেস ফেলতে পারো? কিন্তু কিছুতেই আমাদের কথা শোনে না!

ও বাড়ীর পিসি বলেন, আজকাল কলকাতায় কত সিনেমা হয়েছে কত লোক বেড়ায় কত দিকে,—কিন্তু শিবানী এক পা দেয়না বাড়ীর বাইরে। নিজের শরীর বাঁচলে তবেই ত' স্বামী-সন্তানের সেবা করবি, মা?

কে যেন চাপা গলায় বলে, স্বামী যে বাঁচবে না এ সবাই জানে। মাঝ থেকে নিজের শরীরটাই অযত্নে নষ্ট করা বৈ ত' নয়!

সেদিন ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, শিবানী এলেন পিছনে পিছনে। ডাক শুনে ডাক্তার থমকে দাঁড়ালেন। শিবানী বললেন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

কি বলুন?

আমার স্বামীকে কেমন দেখলেন আজ ?

ঠিক বলা কঠিন, মিসেস রায়।

শিবানী প্রশ্ন করলেন, পাঁচ বছরে কি ওঁর কোনো উন্নতি হয় নি ?

ডাক্তার ভৌমিক বললেন, আপনারা মাঝখানে আমাকে প্রায় বছর খানেক ডাকেন নি। এই পাঁচ বছরে প্রায় কুড়িবার আপনারা ডাক্তার বদল করেছেন।

শিবানী বললেন, ফল না পেলেই ডাক্তার বদলাতে হয়। কিন্তু আর ক'বছর আমাকে রাত জাগতে হবে, ডাক্তার ভৌমিক ?

ডাক্তার একটু অপ্রতিভ হাসি হাসলেন। শিবানীর কণ্ঠস্বরে পাওয়া যায় সমগ্র চিকিৎসক সমাজের প্রতি অনুযোগ। ডাক্তার আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন, ওঁর শরীরে আছে চাপা পক্ষাঘাত, তার ওপর বাত, ব্রেণের দোষ, হার্টের গোলমাল। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, ওঁর চিকিৎসা-বিভ্রাট হয়েছে। মাঝখানে আপনারা হোমিওপ্যাথী করতে গিয়ে অনেকদিন সময় নষ্ট করেছেন।

শিবানী নির্বিকার মুখে প্রশ্ন করলেন, ওঁর বাঁচবার আশা কি একেবারেই নেই ?

ডাক্তার একবার তাকালেন তাঁর দিকে। পরে বললেন, আজ আপনাকে একটু বেশী চঞ্চল দেখা যাচ্ছে। এ আলোচনা আজ থাক্ মিসেস রায়। নমস্কার।

ডাক্তার ভৌমিক বাইরে গিয়ে নিজের মোটরে উঠলেন। কিন্তু অত্যন্ত ভুল ক'রে গেলেন তিনি। শিবানী একেবারেই চঞ্চল নন। চাঞ্চল্যটা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি কেবল জানতে চেয়েছিলেন স্বামীর জীবনের আশা আছে কিনা। যদি মোটামুটি একটা হদিস পাওয়া যেতো যে, বেঁচে উঠতে এতদিন সময় লাগবে, অথবা মৃত্যুর আর মাত্র এতদিন বাকি,—

তাহ'লে রাত্রি জাগরণের হিসাবটাও ওই সঙ্গে পাওয়া যেতে পারতো। এটা স্থিতবুদ্ধির কথা, চাঞ্চল্যের কথা নয়। ডাক্তার নির্বোধের মতো ভুল ক'রে গেল। এটা জীবনমৃত্যুর কথা, হৃদয়াবেগের কথা নয়। স্বামী বাঁচবেন, অথবা বাঁচবেন না—এটা জানবার দরকার শিবানীর আছে বৈকি।

এমন সময় বাইরে একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে নেমে এলেন এক ভদ্রলোক এবং বছর চারেকের একটি ছোট ছেলে। ভদ্রলোক নেমে এসে ডাকলেন, শিবানী, কই রে?

শিবানী বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক বিষন্ন মুখে বললেন, তোর বৌদিদি মারা গেছে কাল দুপুরে। শেষকালটা ভারি কষ্ট পেয়েছিল।

শিবানী প্রশ্ন করলো, শ্মশান থেকে ফিরলে কখন্ ছোড়দা?

ছোড়দা বললেন, ফিরেছি তখন প্রায় রাত এগারোটা। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই, আমাদের সাহেব টেলিগ্রাম করেছে। আজ আমাকে বোম্বে যেতেই হবে। আমার ওখানে আর ত' কেউ নেই, ছেলেটাকে কোথায় রেখে যাই?

শিবানী বললেন, আমার এখানে রাখবে, কিন্তু এবাড়ী ত' দিনরাত ওষুধের গন্ধে ভরা। যদি তোমার ছেলে সুস্থ না থাকে, ছোড়দা?

ছোড়দা বললেন, যা কপালে আছে তাই হবে। কিন্তু একে আমি নিয়ে যাবো কোথায়? তোর এখানে ছাড়া আর কোনো জায়গায় রাখতে আমি ভরসা পাইনে। রায় মশাই কেমন আছেন?

শিবানী জবাব দিল, একই রকম।

নীলিমা!

বুঝতেই পারো!

ছোড়দা বললেন, হুঁ। তোর ছেলেটারও ত' ওই দশা। কবে যে তুই মুক্তি পাবি!

মুক্তি! শিবানীর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো, কিন্তু সে চুপ ক'রে রইলো। যাবার সময় ছোড়দা বললেন, আমার ওখানকার চাটি-বাটি সব তুলে দিয়ে গেলুম। এবার যাচ্ছি অনেকদিনের জন্যে। কানু তোর এখানে রইলো, তোর এখানেই থাকবে।

ছোড়দা চ'লে গেলেন। একটি সমবেদনার কথাও শিবানীর মুখে এলো না। কানুর মা মুক্তি পেয়ে গেছে রোগ থেকে,—দুঃখ কিছু নেই।

সমস্ত বাড়ীখানা নিবিড় শান্ত। চুপ ক'রে থাকো, বাতাসের শব্দ কান পেতে শোনো। মানুষ আছে অনেকগুলি, কিন্তু শব্দ নেই। শব্দটাই জীবন, শব্দহীনতাই মৃত্যু। মাঝে মাঝে হয়ত কোনো রোগীর আর্তকণ্ঠের গোঙানি, হয়ত বা ওই মৃগীরোগী ছেলেটার একপ্রকার বিকৃত আওয়াজ,—তারপরে সব চুপ। বাইরে হয়ত কোনো মধ্যাহ্নকালের পাখীর এক টুকরো কলকূজনের আওয়াজ। আর কিছু নেই। এক ঘরে গিয়ে শিবানী ওষুধ খাওয়ায়, অন্য ঘরে গিয়ে মাথা ধোয়ায়, পাশের ঘরে গিয়ে বিছানা বদলে দেয়। এক গন্ধ থেকে আরেক গন্ধে; এ গন্ধ থেকে ও গন্ধে!

সমস্ত ঘরগুলি মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত, মেঝেগুলি আরসির মতো ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন। ধুলো-বালি-ময়লা-নোংরা কোথাও বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি ঘরের আসবাবপত্র যেন প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, দেওয়ালের প্রত্যেকটি ছবির যেন কিছু একটা ভাষা আছে, আছে একটা চাপা শব্দহীন চক্রান্ত। একা ঘরে ঢুকতে অনেক সময় যেন ভয় করে।

হঠাৎ ওঠে আওয়াজ,—পিসিমা?

ঘরগুলো যেন চমকে ওঠে, আসবাবপত্রগুলো যেন প্রাণ পেয়ে থরথর করতে থাকে। শিবানীর হাত থেকে চামচখানা খ'সে পড়ে। নিঃসাড় প্রেতপুরীর মাঝখানে যেন নবজীবনের ডাক।

শিবানী এসে দাঁড়িয়ে বলেন, কি রে কানু, ভয় করছে, কোলে উঠবি?

কানু ঘাড় নেড়ে বলে, উহুঁ না,—আমাকে যে তুমি বল কিনে দেবে বলেছিলে?

ভাষাটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই। শিবানী বললেন, আজই তোর বল আনিয়ে দেবো। আর কি চাই বল্।

কিচ্ছু না।—পিসিমা, আমি পান সেজে দেবো তোমার জন্যে!—কানু কাছে এসে আবদার ধ'রে বসে।

শিবানী হাসতে গিয়ে চমকে উঠলেন। এর নাম কি হাসি? এ তাঁর মনে নেই! নিজের মুখের চেহারা পাছে তাঁর চোখে পড়ে, এজন্য আয়নার সামনে তিনি চুল বাঁধেন না। এ হাসি তাঁর মুখে কেমন মানালো, একবার দেখলে কেমন হয়?

ছেলেটা কাছে আসতে জানে, ঔদাসীন্যটাকে কৌতূহলে পরিণত করতে জানে। শিবানীকে গম্ভীর দেখে সে আঁচলে ধ'রে বললে, পিসিমা, আমি কাজ করবো!

কী কাজ করবি তুই?

সব কাজ করবো।

শিবানী হাসলেন। বললেন, আচ্ছা দেখে আয় দেখি বারান্দায় চাদর-খানা শুকিয়েছে কিনা?

কানু অমনি ছুটলো। বারান্দা থেকে শুকনো চাদর তুলে আনলো। কী বিজয়গর্ব ওর মুখে চোখে! কী আশ্চর্য সংহত চাঞ্চল্য ওর নধর স্বাস্থ্যশ্রীতে! শিবানী বললেন, এত কাজ করলে তোর যদি অসুখ করে, কানু?

না, অসুখ করবে না, তুমি দেখো।—পিসিমা, আমি আজ থেকে তোমার কাছে শোবো।

আমি কি শুই যে, আমার কাছে তুই শুবি?

তবে আমি থাকবো তোমার কাছে রাত্তিরে?

শিবানী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, আমি যে রুগীর ঘরে থাকি!

কানু বললে, আমিও থাকবো!—আচ্ছা পিসিমা, ওরা অত ওষুধ খায় কেন?

আমি যে অনেক পাপ করেছি তাই ওরা ওষুধ খায়!

কানু অবাক হয়ে পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শিবানী বলেন, আয় কানু, তোকে জামা পরিয়ে দিই।

না, পরবো না!

ওমা, ঠাণ্ডা পড়েছে যে!

না, ঠাণ্ডা পড়েনি!—কানু ছুটে পালিয়ে যায়। রুগ্না জননীর মৃত্যু ঘটেছে সেজন্য ছেলেটার একটুও ভাবান্তর দেখা যায় না। ছেলেটা শূন্যঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে কথা কয়। একদিন বাইরের ঘরের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে সে নেচেই অস্থির। এ বাড়ীর প্রত্যেক ঘরেই যেন তা'র একজন ক'রে বন্ধু লুকিয়ে আছে, কানু নিজের মনেই কানামাছি খেলতে খেলতে সেই বন্ধুদের খুঁজে বেড়ায়। খেলতে খেলতে নিজেই সে মেতে ওঠে; নানা কাজের ফাঁকে শিবানী ওকে লক্ষ্য করেন।

ওঘর থেকে স্বামীর ডাক শুনেই শিবানীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। স্বামী অসুস্থ হ'লে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বাড়ে। শিবানী তাড়াতাড়ি ওঘরে গিয়ে হাজির হন্। রোগীর মুখে একটু জল, একটু ফল, একটুখানি গায়ে হাত বুলানো, বালিশটা ঠিক ক'রে দেওয়া, গায়ের উপর চাদর টানা, জান্‌লাটা একটু ভেজানো, বেড্‌প্যান্‌টা একটু সরানো। শিবানীর হাত অতি নিপুণ, সেবায় অতি একাগ্রতা, যত্নে একান্ত আন্তরিকতা। তারপরে তিনি বেরিয়ে আসেন, বেসিনের কাছে গিয়ে কটুগন্ধ কারবলিক্ সাবান দিয়ে হাত ধোন্। তারপরে যান্ শ্রীমতী নীলিমার কাছে, সেখান থেকে ঘন্টির ঘরে। ঘন্টির তখন মৃগীবিকার দেখা দিয়েছে।

ওমা, কানু তুই কি করছিস এখানে রে?

ঝি এসে হাসিমুখে অভিযোগ জানালো, ওই দেখুন—এক বালতি জল এনেছে, গামছা এনেছে আপনার জন্যে,—আমার কাছে গিয়ে বলে, সৈরুবী, তেলের বাটি দাও! আমি বলি, তেলের বাটি কি হবে, দাদা? বলে, পিসিমা বুঝি চান্ করবে না? আমি যে পিসিমাকে খাইয়ে দেবো!—শুনুন ছেলের কথা!

আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করবেন না শিবানী,—কেননা তার মুখে হাসি দেখলে ঝি-চাকররা চমকে উঠবে। তিনি বললেন, আচ্ছা না হয় খাইয়েই দিবি, কিন্তু জল ঘেঁটে যদি অসুখ করে?

কানু মুখ ফিরিয়ে বললে, বললুম যে অসুখ করবে না?

তুই কি পণ্ডিত যে, সবজান্তার বড়াই করিস?

কানু ভাবলো, না, পণ্ডিত সে নয়। সুতরাং হতাশ হয়ে সে পিসিমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ঝি একেবারে হেসেই অস্থির।

কানু এসেছে, যেন প্রাণ এসেছে বাড়ীতে। তার চলাফেরার মধ্যে মুক্তির সংবাদ আছে। সে যেন অচল জড়তাকে আঘাত করে। সে যেন তুষারস্তূপের মধ্যে উত্তাপ আনে, সেই উত্তাপে বিগলিত প্রাণধারা নেমে আসে। তার সারাদিনের কলকণ্ঠ আর কাকলী যেন প্রত্যেকখানা ঘরের ভিতরকার বহুকালের অসাড়তাকে মুখর ক'রে তোলে। শিবানী চুপ ক'রে নতুন পাখীর কাকলী উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। শুনতে শুনতে নিজের মধ্যে তিনি ডুবে যান্।

কানু স্বাধীন। সে নিজে স্নান করবে, ভাতের থালা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে বামুনঠাকুরের কাছে, নিজে জামা জুতো পরবে, এবং নিজের মাথা নিজেই আঁচড়াবে। পিসিমার কোনো সাহায্য না নিয়েই সে চলবে,—এবং যতটুকুই হোক, পিসিমার পায়ে-পায়ে ঘুরে তাঁর কাজে কিছু সাহায্য সে

করবেই। ছেলেটা অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, এবং চেহারাটা সত্যকার সুশ্রী। সন্ধ্যার পর সে যখন যেখানে-সেখানে ঘুমে লুটিয়ে পড়ে, শিবানী এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তা'র সামনে। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে তাঁর,—কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে। ছেলেটা এ বাড়ীতে আসার পর থেকে তাঁর কাজ কিছু বাড়ে নি, বরং কাজ কমেছে, বরং আজকাল তাঁর কপালে একটু বিশ্রামও জোটে।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একদিন বললেন, মিসেস রায়, নীলিমার আমি কোনো উন্নতি করতে পারলুম না। আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

শিবানী বললেন, আর কতদিন মেয়েটা ভুগবে আপনি মনে করেন?

তিনি বললেন, আমাদের ওষুধ হোলো দীর্ঘ-মেয়াদী,—অনেকদিন পর্যন্ত ধৈর্য না রাখলে ফলাফল দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রোগীর অবস্থা খারাপ হচ্ছে, মিসেস রায়।

পরের দিন থেকে শিবানী অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করলেন। ব্যবস্থাটা রাজোচিত এবং বারবহুল। কিন্তু সেদিকে শিবানীর ভ্রূক্ষেপ নেই। এ তিনি জানেন, এ হবে,—এ হোলো নিয়তি। কিন্তু এর শেষ তিনি দেখতে চান্, দেখতে চান্ অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। মেয়েটা যেন দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে। মোমবাতিটা জ্বলছে, নিবেও যাবে এক সময়ে, কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঠিক আন্দাজ করা যায় না,—কাঁটায়-কাঁটায় মোমবাতিটুকু কখন্ শেষ হবে। কিন্তু প্রত্যেকটির চরম লগ্ন নির্ভুলভাবে জানা গেলে ভালো হোতো। বলা বাহুল্য শিবানীর মুক্তি চাই। শুধু দৈহিক মুক্তি নয়, মুক্তি চাই মনে, মুক্তি চাই চিন্তায়, কল্পনায়। সমস্ত প্রকার বিভীষিকার ভিতর দিয়ে যদি সে-মুক্তি আসে, সেও ভালো।

পাড়ার লোকের মধ্যেও জানাজানি হয়ে গেছে যে, শিবানীর স্বামীর আর কোনো আশা নেই। যে-কোনো দিন যে-কোন সময়ে বজ্রাঘাত হতে পারে।

পাড়ার লোক থাকে কান পেতে, কতক্ষণে তারা শিবানীর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ডুকরে-ডুকরে কান্না শুনতে পাবে। ঝি-চাকর উঠবে চেঁচিয়ে, বাইরের লোক ছুটোছুটি করবে, শুনবে সম্মিলিত চীৎকার।

এমনি সময়ে এলেন বিধবা ননদ, এলেন মামাশ্বশুর, এলেন বড় বড় ছেলেমেয়ে তিন চারজন। বাড়ী ভরে উঠলো এবার কোলাহলে। কানু হকচকিয়ে এসে দাঁড়ালো পিসিমার পাশে। শিবানী বললেন, ওদের দেখে ভয় করছে নাকি রে কানু?

ভয়? না—কানু হাসলো। তারপর ছুটে চলে গেল খেলা করতে।

এর পরে দিন হোলো গোণাগুণতি! কেননা আত্মীয়রা এসেছিলেন মিঃ রায়ের অন্তিমকালে। তাঁরা সেবা করতে আসেন নি, এসেছেন সৎকার করতে। তাঁরা জানতেন, পাঁচ বছর ধরে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে যে-নারী স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে না,—স্বামীর মৃত্যু সে কি বরদাস্ত করতে পারবে?

হেমাঙ্গিনী—শিবানীর বড় ননদ—শিবানীর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কখনো যা দেখি নি তাই দেখলুম তোর সেবায়,—অনেক করলি তুই। কিন্তু বাঁচা-মরা তোর হাত নয় বৌ!

শিবানী চুপ করে রইলো। পা তার ঠাণ্ডা। হেমাঙ্গিনী পুনরায় বললেন, ভাইটির আশা আর নেই, চোখেই দেখছি। কিন্তু তোকে আর জাগতে হবে না—ছেলেমেয়েরা এসেছে, ওরাই সব করবে।

মামাশ্বশুর ওধার থেকে ডাকলেন, হেম?

হেমাঙ্গিনী সাড়া দিলেন, মামা কিছু বলছেন?

হ্যাঁ, বৌমাকে বলো,—উনি একটু বিশ্রাম নিন্।

শিবানী শিউরে উঠে বললেন, বিশ্রাম নিতে গিয়ে যদি ঘুম আসে, দিদি?

বেশ ত, ঘুম আসে—ঘুমোবি ? হয়েছে কি ?

কিন্তু আপনারা কি পারবেন অত কাজ ?

ওমা, তা কেন পারবো না ? ওরা চারজন, আমি নিজে, মামা রয়েছেন মাথার ওপর,—তারপর ঝি-চাকর-বামুন—সবাই আছে। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, বৌ !

ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে ঘণ্টা দুই আগে। কিন্তু অনেককাল পরে এতগুলি মানুষ চারিদিকে দেখে শিবানী যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করছিলেন। ডাক্তার বলে গেছেন, আজকের রাতটা হয়ত কাটবে, কিন্তু আসছে কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত কাটবে কিনা বলা খুব কঠিন। মিঃ রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন।

আসছে কাল বেলা বারোটা ?—সে অনেক দেরী। শিবানী সমস্ত সযত্নে গুছিয়ে রেখে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে গেলেন। দরকার হ'লে মুহূর্তের মধ্যে তিনি উঠে আসবেন। রোগীর আর কোনা আশা নেই, কিন্তু তাঁরও আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। অন্যদিন এমন সময় বিশ্রামের কথা তাঁর কল্পনাতেও আসে না, আজকে কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া অন্য কিছু তিনি ভাবতেও পারছেন না।

নীলিমা রইলো একজনের হেপাজতে, ঘটি রইলো আরেক জনের তদ্বিরে। ওদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই। স্বামীর বিছানার চারপাশেও রয়েছে সবাই। পলকে-পলকে তাঁর তদারক চলছে। বিগত কুড়ি বছরের কথা আজ তাঁর মনে পড়ছে। একটি দিনের জন্যও স্বামীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয় নি ; কখনো কোনো কারণে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিতর্ক বাধে নি। দুই দেহ শুধু আলাদা, কিন্তু দুইয়ে মিলে এক, অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য ! কুড়ি বছরের ইতিহাস সগৌরবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

ক্লান্তিতে শিবানীর দুই পা অবসন্ন, সর্বশরীর টলটল করছে। তিনি

বাইরের দিকে এলেন, যেদিকটায় ঔষধপত্রের গন্ধটা কিছু কম। দক্ষিণের ঘরে কানু নিজের বিছানায় এসে শুয়ে থাকে, কিন্তু আজ কানু সেখানে নেই। শিবানী ঘুরতে ফিরতে এলেন বাগানের দিককার কোণের ঘরের দিকে। জানালা দিয়ে সেখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে; সেই আলোর আভায় তিনি দেখলেন, কানু অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে খাটের ওপর। একা ঘরে অন্ধকারে এসে শুতে ছেলেটার একটুও ভয় করে না।

সন্ধ্যার পরে এদিকটা একটু নিরিবিলি। দূরে কাদের বাড়ীতে যেন রেডিয়ো যন্ত্রটা খোলা আছে। নারীকণ্ঠের মধুর কীর্তন শোনা যাচ্ছিল। কানুর পাশে এসে শিবানী তাঁর আড়ষ্ট দেহটা ছড়িয়ে দিলেন, এবং আঁচলটা চাপা দিলেন কানুর গায়ে। চোখের পাতা তাঁর ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু কীর্তনের স্বরপ্রবাহটাকে ছাড়িয়েও তিনি কান খাড়া ক'রে রাখলেন ভিতর বাড়ীর দিকে,—যেদিকে রোগীর ঘর।

বোধ হয় ঘণ্টা দুই পরে হবে। একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকলো।—মামীমা, ও মামীমা,—শিগগির উঠুন, মামা কেমন করছেন! শিগগির আসুন, ও মামীমা—?

শিবানী জেগে উঠলেন, জড়িত কণ্ঠে বললেন, চলো যাচ্ছি কিন্তু আমি আর কী করবো, সবিতা?

সবিতা ছুটে চ'লে গেল। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েও শিবানী আবার শুলেন কানুর পাশে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

আবার এলো দুটি ছেলেমেয়ে আর হেমাঙ্গিনী নিজে। শিবানীর শয়নের ভঙ্গী আর নিশ্বাসের অসমতাল লক্ষ্য করে ওঁরা ধ'রে নিলেন শিবানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। হেমাঙ্গিনী কাছে এসে শিবানীর মাথায় হাত রেখে বললেন, বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল, তুই আর কাঁদিস নে বৌ তা'র জন্যে। সে জুড়িয়ে গেছে। আচ্ছা, তোর আর উঠে কাজ নেই,—ওরাই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে

সব কাজ করবে। তোকে আর কিছু দেখতে হবে না!—এই ব'লে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন।

শিবানী কিন্তু তখন অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত। কোন কথাই তাঁর কানে ওঠে নি।

ঘুম তাঁর ভাঙ্গলো পরের দিন সকাল ন'টায়,—ওরা সবাই তখন শ্মশান থেকে ফিরেছে। ঘুম ভাঙ্গালো কানু। ঘুম থেকে উঠে টলতে টলতে শিবানী যখন রোগীর ঘরে গেলেন, দেখলেন ঘরে স্বামী নেই! স্বামী মারা গেছেন বুঝতে বাকি রইলো না,—কিন্তু কখন্ মারা গেছেন, এবং মৃত্যুকালে তাঁকে ডাকা হয়েছিল কিনা কিছুই তাঁর মনে নেই! তাঁর মনে নেই গতরাত্রির কোনো কথা!

শিবানী ঘরের দেওয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু ভাববার চেষ্টা ক'রেও তাঁর মাথায় কিছু ঢুকলো না। শোক সন্তাপের চেতনা তাঁর আসছে না, আসছে শুধু দুই চোখ ভ'রে গাঢ় নিশ্চিন্ত নিদ্রা। যত শীঘ্র সম্ভব স্নান সেরে কোরা থান কাপড় প'রে তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারলে বাঁচেন!

দিন পনেরো বাদে কানুকে সঙ্গে নিয়ে শিবানী চ'লে গেলেন দেওঘরে। ওরা সবাই রইলো বাড়ীতে। রইলো দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে নীলিমা, রইলো বিকলাঙ্গ ছেলেটা একপাশে। কানুকে নিয়ে তিনি গিয়ে নামলেন সাঁওতাল পরগণার মাঠে। হেমন্তের আকাশ শিউরে উঠেছে তখন নীলবর্ণ সমারোহে। এ মাঠের হাওয়ায় ঔষধের গন্ধ নেই, বিকারের প্রলাপ নেই। আর্তের নৈরাশ্য নিশ্বাস নেই। অখণ্ড অনন্ত মুক্তি মাঠে-ময়দানে। পাশে আছে তাঁর এক ক্ষুদ্র বালক। হাস্যমুখর, চিত্তচঞ্চল, বলিষ্ঠ, আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল! ও যেন ওই উদার মাঠের অপরিসীম মুক্তির মন্ত্রটি জানে। ও জানে নবজীবনের সংবাদ, নবতারুণ্যের জয়গান। ওকে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান্ মাঠে মাঠে।

শিবানীর থাকবার কথা ছিল এখানে দিন পনেরো। কিন্তু প্রায় দেড়মাস তিনি থেকে গেলেন। তারপরে এক টেলিগ্রাম এলো, নীলিমার অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে, শীঘ্র এসো।

নীলিমা? মনে প'ড়ে গেল বটে বাড়ীতে আছে রুগ্না নীলিমা আর বিকলাঙ্গ ঘন্টি। সেইদিনই শিবানী জিনিষপত্র গুছিয়ে কানুকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরবেলায় কলকাতার গাড়ীতে উঠলেন।

গাড়ী যখন ছাড়বে, গার্ডের বাঁশী যখন বাজলো,—সহসা তাঁর নাকে এলো সেই কঠিন ওষুধের গন্ধ, সেই বাড়ীর ব্যাধি ও বিকারের গন্ধ। তিনি চট্ ক'রে কানুর হাত ধ'রে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিলেন, এবং জিনিষপত্র নিজের হাতেই তাড়াতাড়ি টেনে নামালেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

তিনি না গেলে কীই বা ক্ষতি? মৃত্যুর সামনে তিনি আর নাই বা গিয়ে দাঁড়ালেন।

দেনা-পাওনা

কেশব চৌধুরী মারা গেলেন বেলা তখন তিনটে। লোকটা যে পুণ্যবান তা'তে আর সন্দেহ নেই। কেননা এ যুগের দৈনন্দিন জীবনে কত রকমের উৎপীড়ন, কত রোগ ভোগ, কত বিচিত্র ঔষধ পত্র,—কিন্তু কেশব চৌধুরী কোনোটারই তোয়াক্কা রাখলেন না। তিনি হঠাৎ মারা গেলেন হৃদ্‌রোগে।

বাস্তবিক সকলেই অবাক। ভদ্রলোক আজ সকাল বেলাতেও বাইরের ঘরে ব'সে খবরের কাগজ পড়েছেন—এবং যেহেতু তাঁর একটু আধটু রাজনীতি চর্চা করা অভ্যাস ছিল,—সেজন্য সকাল দশটায় আপিস বেরোবার আগে পাড়ার দু'একটি লোকও বাইরের ঘরে তাঁর সঙ্গে ব'সে চা খেয়ে গেছেন। কাগজপড়া হয়ে গেলে তিনি নিজের হাতে বাজার-হাট ক'রে এনেছেন। গয়লা এসেছিল মাস কাবারে টাকা নিতে,—তা'র সঙ্গেও তিনি কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক করেছেন। ভাড়াটেদের কাছে টাকা নিয়ে রসিদ কেটে দিয়েছেন। এই ত' বেলা এগারোটার সময়েও স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বচসা হয়ে গেছে। স্ত্রী বলছিলেন, ব্ল্যাকমার্কেট থেকে চা'ল না কিনে আনলে কাল থেকে আর ভাত দিতে পারবো না এবং আজকাল অধিকাংশ ভদ্রপরিবার চোরাবাজার থেকে চা'ল কিনতে বাধ্য হচ্ছে। কেশববাবু বলছিলেন, ছি, এসব কথা মুখে আনাও পাপ। ব্ল্যাকমার্কেট করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য, কংগ্রেসের আদর্শবিরোধী,—দেশকে যদি অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে চাও, তবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। লোকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে আরো অবাক হোলো এই কারণে যে, সত্যই তিনি হৃষ্টপুষ্ট লোক ছিলেন এবং বাড়ির লোকেরা তাঁর মাথাধরাটি পর্যন্ত জানতো না। তাঁর দেহটির চিক্কণ চাক-

চিক্যের কথা সকলেরই জানা ছিল। আজ আপিসের বার,—তাঁকেও আপিসে যেতে হোতো, কিন্তু আপিসের সাহেব নাকি মারা গেছে,—বিলেত থেকে এই খবর আসার জন্য আপিস আজ বন্ধ। অপ্রত্যাশিত ছুটি পেয়ে কেশববাবু বাজার থেকে আজ মহামূল্য ইলিশ মাছ এনে স্ত্রীকে খুশী করেছেন। বেলা বারোটার পর স্নান এবং আহারাদি সেরে পানটি মুখে দিয়ে বিশ্রামের জন্য ঘরে উঠেছেন। বালিশের পাশে তখনো রয়েছে সকালের খবরের কাগজ আর একখানা নভেল। বাড়ির ছোকরা চাকরটা আড়াইটে নাগাৎ আর এক ছিলিম তামাকও দিয়ে গেছে। তামাকের নলটা তখনো তাঁর হাতে। তামাকটি টানতে টানতে কোন্ এক সময়ে একটু কাশি, একটু বমিভাব, একটু হাওয়ার অভাব,—তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। দিনের বেলা কোনোকালে তিনি ঘুমান না। সুতরাং তাঁকে ঘুমোতে দেখে স্ত্রী এসে দাঁড়ান এবং সন্দেহক্রমে কাছে এসে স্বামীর গায়ে হাত দিয়েই তিনি চমকে ওঠেন। ততক্ষণে কেশববাবু নশ্বরদেহ ত্যাগ ক'রে গেছেন। ডাক্তার মিথ্যেই এসেছিলেন একবার।

আশ্চর্য, লোকটা যেন সবাইয়ের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ পালিয়ে গেল। কান্না পাচ্ছে না কারো, কেননা সবাই স্তম্ভিত। তামাকের নলটা হাতে ধরা রয়েছে তখনো, তখনো কল্‌কের মধ্যে আগুন রয়েছে এবং ঘরের মধ্যে অম্বুরী তামাকের সুগন্ধ। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরিতৃপ্তির আভাটা তখনো মুখের উপর প্রসন্ন হয়ে রয়েছে, গালের মধ্যে স্ত্রীর সাজা পান তখনো ফুরোয়নি। নভেলখানার একটি বিশেষ পৃষ্ঠা তখনো চিহ্নিত করা রয়েছে। কে বলবে মারা গেছে! ঠিক যেন অকাতরে ঘুমিয়ে আছে লোকটা। সবাই স্তম্ভিত।

মৃত্যুর পরের ক্রিয়াকর্ম কি কি, এ আর নতুন ক'রে কারো শেখবার নেই। প্রথমেই যে কথাটা সকলের মনে এলো, সেটা হোলো একখানা খাট। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে যখন খাট এসে পৌঁছলো তখন স্থির হোলো, না, এ

সময়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে না। ছেলেরা গেছে ইস্কুলে, বড় মেয়ে দু'টি তাদের ভগ্নিপতির সঙ্গে গেছে সিনেমায়, দেবর আর ভাসুর গেছেন আপিসে, মেজ ভাই নরেশ একখানা দরখাস্ত আর কেশব চৌধুরীর সুপারিশ পত্র নিয়ে কোন্ আপিসের বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে দুপুর বেলায় সুতরাং তারা সবাই বাড়ি না ফিরলে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যে চলবে না—এ বলাই বাহুল্য।

আর একটা কথা আছে। কেশব চৌধুরী এ অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তি। হঠাৎ এই ব্যক্তি সুস্থ শরীরে দু' মিনিটের মধ্যে মারা গেছে,—এ খবরটা পাড়ার লোকের কাছে বিশ্বাস্য ব'লে মনে হবে না, অতএব কোনো প্রকার ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাড়ির প্রবীণা মহিলাদের বিশ্বাস, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্ত বন্ধনগুলি খুলে দিতে হয়। কেবল তাই নয়, মৃত ব্যক্তিকে খোলা জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখাটাই বিধি। কিন্তু এ বাড়ির উঠোনটা প'ড়ে গিয়েছে ভাড়াটেদের মহলে—ছাদ ছাড়া এখন আর খোলা জায়গা কোথাও নেই। কিন্তু যে মৃতদেহ এখনই যাবে শ্মশানে, তা'কে ছাদে তোলাটার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। আলাপ-আলোচনার পর এইটিই স্থির হেলো যে, যেহেতু কেশব চৌধুরী এ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, সেই হেতু তাঁর মৃতদেহ এ বাড়ির বাইরে গলি-পথের ঠিক সামনেই রাখা হোক। তাঁকে শ্রদ্ধা করতো সকলেই, সুতরাং জনসাধারণ যাতে মৃত ব্যক্তির প্রতি সহজে শ্রদ্ধা জানাতে পারে,—সেই প্রকার ব্যবস্থা করাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি জনসাধারণের বন্ধু ছিলেন কে না জানে।

খাটখানার উপর পরিপাটি ক'রে বিছানা সাজান হোলো। কেশববাবুর স্ত্রী নিজের হাতে তোষকের উপর ধোপ-দস্ত চাদরখানা পেতে দিলেন। তসরের চাদরখানা দিয়ে মৃতদেহকে আচ্ছাদিত করা হোলো। তার ওপর

কেশব চৌধুরীকে শুইয়ে খাটসুদ্ধ তাঁকে বাইরে নিয়ে এলো সবাই মিলে। অনেকে খবর পেয়ে ইতিমধ্যেই এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। বেলা তখন চারটে বেজে গেছে। পাড়ার কয়েকটি ছেলে ইতিমধ্যেই নিজেদের ভিতরে চাঁদা তুলে দু'টি ফুলের তোড়া আর কয়েকগাছি মালা এনে খাট সাজাতে বসে গেছে। মৃতের মুখের চেহারা দেখলে জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কোনো আস্থা থাকে না। জীবনটা যেন পদ্মের পাতায় জলের ফোঁটার মতন টল টল করছে। এই আছে এই নেই। এত স্নেহ মোহ এত টানা-হেঁচড়া, এত আসক্তি,—কিন্তু হায়, পলকের মধ্যেই সব ফর্সা! বাস্তবিক, জীবনটা একেবারেই মিথ্যে!

মুখখানায় মৃত্যুর কোন ছাপ এখনো পড়েনি। গায়ে হাত দিলে এখনো উত্তাপ। বয়স হয়েছিল বটে, কিন্তু শরীরের বাঁধন ছিল অটুট,—রূপবান এবং সুপুরুষ ব'লে আজও কেশব চৌধুরীর খ্যাতি আছে। কেশব যেন ঘুমিয়ে আছেন পরম নিশ্চিন্তে।

সামনের বাড়ির কালী চাটুয্যে নেমে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, চেহারাটার জন্যই ত' কেশবের চাকরি হয়েছিল! সে আজ বত্রিশ বছর আগেকার কথা বলছি। আমি তখন জার্ডিনের বাড়ি চাকরি করছি। হরমোহন রায়ের কাছে কেশব গিয়ে দাঁড়ালো একখানা দরখাস্ত নিয়ে। বড়বাবু একবার মুখের দিকে দেখলো,—ব্যস সঙ্গে সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ টাকায় বসিয়ে দিলে। তোমরা আর ক'দিনের লোক বলো! আর চেহারাটা ভালো হ'লে বুঝতেই পারো তা'র বিপদও অনেক।

বিপদ কিসের?

কালী চাটুয্যে বিজ্ঞের হাসি হাসলেন। পরে বললেন, আমার বয়স কত হয়েছে মনে কর তোমরা?

কেউ বললে ষাট, কেউ সত্তর, কেউ বা বাহাত্তর। তিনি বললেন,

কেশবের চেয়ে আমি চৌদ্দ বছরের বড় তা জানো? আমার বয়স হোলো আটষট্টি। আমি যখন চাকরি করি তখন কেশব এই গলিতে গুলী খেলতো। গাড়োয়ানকে লুকিয়ে ঘোড়ার গাড়ীর পিছনে চড়তো। মনে করো সেই থেকে আমি জানি কেশবকে। আজ মারা গেছে ব'লেই যে ওর নিন্দা করছি তা নয়, আমি বলছি ভালো চেহারা হ'লে তা'র বিপদ কত!

কেউ কেউ যেন একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলো। কালী চাটুয্যে সেখান থেকে একটু স'রে গেলেন এবং তিন চারজন ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলো। তিনি বললেন, কেশব সকলেরই প্রিয় ছিল। এককালে থিয়েটারে নেমে হিরো সাজতো,—সবাইকে মাতিয়ে তুলতো। ওকে নিয়ে একদিন কত আমোদ আহ্লাদই করা গেছে! ও আগেই গেল; আমরাও যাব ওর পিছু পিছু! ওঁ নমো হরিনারায়ণায়!

ছুটি লোক উৎসুক প্রশ্ন করলো, কি যেন বলছিলেন আপনি?

কালী চাটুয্যে বললেন, শুনবে তাহ'লে বলছো? তোমরা ত' বাবা নতুন এসেছ এ পাড়ায়, কতটুকু আর জানো! ওই যে দেখছো হল্‌দে একতলা বাড়ীখানা,—ওর মালিক ছিল সেই আমাদের রমণী মজুমদার। কাঠা চারেক জমী নিয়ে হাইকোর্টে আমার সঙ্গে ওর মামলা বেধেছিল। লোকটা ছিল ভারী শয়তান। সে যাক গে,—এখন ত' আর নেই। বাড়ী-ঘর বেচে রাসবাগানে চ'লে গেছে। রমণীর ছিল এক বিধবা বোন! এখনকার মতন ত' আর নয় যে, কুমারী সেজে বিধবারা পথেঘাটে আমোদ ক'রে বেড়াতো! তখন বাবা শাসন ছিল!

তারপর?

কালী চাটুয্যে বললেন, না না, হাতে গঙ্গাজল নিয়ে আমি বলতে পারি কেশবের কোন দোষ ছিল না। রমণীর বোনটাই ওকে আড়ালে আবডালে ইশারা করতো আমরা জানতুম। ওই যে ফণী মিত্তিরের গলি,—ওর উত্তরে

ছিল পিরিলিদের বাঁশ বাগান। সেইখানে একদিন রাত্তিরে ধরা পড়ে কেশব আর রমণীর বোন। একজন ছুতোর করাত নিয়ে বৃষ্টির দিনে বাঁশ কাটতে এসেছিল। তা'র মুখ থেকে আমিই প্রথম শুনি! ওঁ নমো হরিনারায়ণায়!

অত্যন্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে কালী চাটুয্যে বললেন, গতস্য শোচনা নাস্তি! কেশবটা যেন অন্ধকার ক'রে চ'লে গেল! আর সত্যি বল্‌তে কি, কেশবের বুকের ছাতি ছিল দরাজ। মেজাজটাও ছিল উঁচু। এমন একটা লোক আজকাল খুঁজে পাওয়া যায় না হে।

বিকেলের দিকে আস্তে আস্তে এই পথ দিয়ে লোকজনের আনাগোনা বেড়ে চললো। আপিস-ইস্কুলের ছুটির পর এখন এই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে বহু লোক। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সন্দেহ নেই। মৃতদেহ সাজানো হয়েছে ফুলের তোড়া আর মালা দিয়ে; সর্বাঙ্গে তসরের আচ্ছাদন। বাড়ির মেয়েরা ইতিমধ্যে আবার মৃতব্যক্তির মুখের উপর বরচন্দন এঁকে দিয়েছে। মৃত্যুর পরেও কেশব চৌধুরীকে যেন রূপবান বলে সবাই স্বীকার করে।

পাশের বাড়ির মুখুজ্যে মশাইয়ের স্ত্রী বললেন, গরীবের বন্ধু চ'লে গেল মা। আজকালকার লোকে দুটো পয়সা হাত উপুড় করতে চায় না। কিন্তু এ পাড়ায় কেশব না থাকলে কি ওই সুজন লাহিড়ীর মেয়েটার বিয়ে হোতো? এক কথায় ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেছিল। কেশবকে দেখলেও পুণ্যি!

কথাটা ভাড়াটে গিন্নির কানে গেল। যে-কারণেই হোক বাড়ির ভাড়াটেরা কেশববাবুর প্রতি খুব প্রসন্ন ছিলেন না। অবশ্য ভাড়াটে মাত্রেই বাড়ীওয়ালার প্রতি বিরূপ। তবু গিন্নি একটু গলা নামিয়ে কা'কে যেন বললেন, আমাদেরই কপাল মন্দ, নৈলে আমরাই বা তাঁর মন পেলুম না কেন। তিনখানি ঘরের ভাড়া নিচ্ছিলেন একশো টাকা,—তার ওপর

ভাড়া দেবার আগে বিনা রসিদে নগদ পাঁচশো টাকা সেলামী। দিতেই হোলো! না দিলে তখন ঘরভাড়া পেতুম কোথায় বলো! তবে কিনা মারা গেলে মানুষের আর কোনো দোষ নেওয়া উচিৎ নয়। আহা, জলজ্যান্ত মানুষটা!

অনেক লোক জ'মে গেছে গলির মোড়ে। কর্তারা আর ছেলেরা অনেকেই বাড়ি ফিরে হৈ চৈ আরম্ভ করেছে। সমবেদনা জানাবার লোক বেশী সংখ্যায় পাওয়া গেলে মেয়েরা কান্না আরম্ভ করে। এইবার উচ্চকণ্ঠে বাড়ির মহিলারা কান্না তুলেছেন। কেশববাবুর স্ত্রী এতক্ষণ পরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। বাড়ির পুরুষেরা বাইরে এক জায়গায় শোকার্ত হৃদয়ে ব'সে আলোচনা করছেন, তাঁদের পরিবারের মুকুট-মণি কেশবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কি প্রকার সমারোহের সহিত সম্পন্ন করা উচিৎ। কেবল যে পাড়াপল্লীর নরনারীগণের সমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল তাই নয়, কলকাতার বহু সমাজেই কেশব চৌধুরী সুবিদিত। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব মন্ত্রী কৃত্তিবাস কুণ্ডু,—তাঁর মাসতুতো ভাইয়ের শ্যালক ছিলেন কেশবের সহপাঠী,—সুতরাং মন্ত্রীমহলেও কেশবের আনাগোনা ছিল। তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

পাড়ার অবনীবাবু ছুটতে ছুটতে এসে কেশবের খাটের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছতে লাগলেন। কেশব তাঁর বহুকালের বন্ধু, দুজনে অভিন্ন-হৃদয়। এমন আকস্মিক বজ্রাঘাতের জন্য তিনি কখনই প্রস্তুত ছিলেন না। শোকের আঘাতে অবনীবাবু একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য দুটি লোক পাশে এসে দাঁড়ালো।

একজন বললেন, চুপ করো হে অবনী, চুপ করো। কাঁদলে কি আর কেশব ফিরবে? জীবনটা যেন ঠিক ভোজবাজী!

আরেকজন বললে, চোখের সামনে ভাসছে সব।—গলা নামিয়ে পুনরায়

তিনি বললেন, এখনো পনেরো দিন হয়নি। দমদমার বাগানবাড়ীতে আমাদের সঙ্গে কেশব কি মাতামাতিটাই ক'রে এলো।

অবনীবাবু অত শোকের মধ্যেও মুখ ফিরিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললেন, চুপ, শুনতে পাবে কেউ! ওসব কথা এখন চেপে যাও!

হ্যাঁ, চেপে ত' যাবোই। ওসব কথা তুমি-আমি ছাড়া আর কেই বা জানে বলো? হ্যাঁ, কেশবের বাহাদুরী ছিল বৈকি। স্বাস্থ্যের বাঁধুনিটা দেখালে বটে!

রাস্তায় অনেক লোক জমে গিয়েছে। এক এক জায়গায় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অনেকেই কেশব চৌধুরীর আলোচনা করছিল। পাড়ায় কোন আন্দোলন দেখা দিলে কেশবকেই লোকে ডেকে নিয়ে যেতো। তাঁর বক্তৃতায় আগুন ছুটতো। তিনি পূজো কমিটির প্রেসিডেণ্ট, নাট্য সমিতির হর্তাকর্তা, করদাতা সঙ্ঘের চেয়ারম্যান। কোন কোন দলের লোক এর মধ্যেই স্থির করেছে যে, রীতিমতো শোভাযাত্রা করে শ্মশানে না নিয়ে গেলে মৃতের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানো যাবে না। স্থানীয় জনসাধারণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করুক যে, তাদের অকৃত্রিম বন্ধু অকালে বিদায় নিয়েছে। কেশব চৌধুরী তাঁর জীবদ্দশায় সকলের সেবা ক'রে গেলেন, কিন্তু নিজের মৃত্যুকালে তিনি কারো সেবা নিয়ে যান নি। আগামী কালের সংবাদপত্রে শোক সংবাদের শিরোনামায় আজকের এই খবরটি অবশ্যই ছাপা হবে। কেশববাবু ছিলেন আত্মত্যাগী এবং একজন বিশিষ্ট নীরব দেশকর্মী। তাঁর গোপন দানের কথা সর্বত্র সুবিদিত ছিল। তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হোলো।

কেশব চৌধুরীর ভাগ্নে রামু বসেছিল বাড়ির দরজায়। মুখখানা তা'র কঠিন, কপালের শিরাগুলি স্ফীত, চোখ দুটো লাল—এবং সে একান্তে ব'সে দুই হাতে নিজের মাথার চুলগুলো শক্ত মুঠিতে ধরেছিল। মাতুলের জন্ত শোক অপেক্ষা মাতুলের মৃত্যুতে তা'র নিজের সর্বনাশের কথাই যেন সে

ভাবছিল বেশী। এমন সময় একটি ছোকরা তার কাছে এসে দাঁড়ালো। চাপা গলায় বললে, মামা তা'হলে তোকে পথে বসিয়ে গেল, কেমন? এতদিনের মধ্যে কিছুতেই একটা সই করিয়ে নিতে পারলিনে তুই?

রামু মুখ তুললো। দাঁতে দাঁত চেপে একপ্রকার হিংস্র উত্তেজনা দমন করে বললে, আজ সকালেও চেষ্টা করেছিলুম! কাগজপত্র নিয়ে সামনে ধরে বললুম, শিগগির সই দাও সেজ মামা, নৈলে আমাদের সম্পত্তি আর কিছুতেই উদ্ধার হচ্ছে না। বললেন, বাজার থেকে ফিরে সই ক'রে দেবো দাঁড়া। কিন্তু বাজার থেকে এসেই তিনি বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে তখন পাড়ার লোকের আড্ডা বসেছে। আমার কাজের কথা তিনি ভুলেই গেলেন।

তোর মামার ধড়িবাজি কি আগে জানতিস নে?

রামু আবার নিজের চুলের মুঠি জোর ক'রে টিপে ধরলো। উত্তপ্ত নিশ্বাস তার নাক আর মুখ দিয়ে নির্গত হচ্ছিল; সেই তিক্ত জ্বালাময় অনুশোচনা বর্ণনা করা যায় না। কিছু একটা সামগ্রী তখন দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে হয়ত রামু তখন কতকটা স্বস্তি পেতে পারতো। তার মাথাটা ঘুরছিল,—এ বাড়ীর শোক সন্তাপের দিকে তার ভ্রূক্ষেপও ছিল না।

হঠাৎ সে মুখ তুললো। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে সে আস্তে আস্তে বললে, পাড়াশুদ্ধ লোক কেঁদে আকুল হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ লোক তাঁকে জানে কতটুকু? আমি যা চোখে দেখেছি তা যদি এখন বলি, তবে মামার বদলে আমাকেই লোকে পুড়িয়ে মারবে!

রামু সেখান থেকে উঠে সটান বাইরের দিকে কোথায় যেন চ'লে গেল। অর্থাৎ এমন শ্রদ্ধা তা'র একটুও নেই, যার জন্যে সে শবযাত্রায় যোগদান করবে।

তাঁ'কে অমনি ক'রে চলে যেতে দেখে কেশব চৌ... শ্যালক বললেন, রামু রাগ করে চলে গেল কেন ? একমাত্র ভাগ্নে, ওর পক্ষেও ত' শ্মশানে যাওয়া উচিত !

মহিমবাবু চুপি চুপি বললেন, জন-জামাই-ভাগ্না, তিন নয় আপনা !

একজন বললেন, মামা-ভাগ্নের মন কষাকষি বুঝি মরবার পরেও মিটতে নেই ?

জনৈক চশমাপরা ফিনফিনে অফিস ফেরতা ভদ্রলোক বললেন, লোকের প্রাইভেট লাইফ খুটিয়ে আমাদের কি দরকার ? পাড়ার একজন লীডার মারা গেলেন, এই আমাদের পক্ষে মস্ত ক্ষতি !

তাঁর ঠিক কানের পাশেই একটি ছোট যুবক দলের মধ্যে ... যেন উত্তপ্ত আলোচনা চলছিল। ভদ্রলোক সেই দিকে ফিরে হঠাৎ বল... তোমরা ভাই দেশের ভবিষ্যৎ, তোমরাই আশা ভরসা ! তোমাদের মু... কে এসব মন্তব্য কেউ প্রত্যাশা করে না। আজকাল কোন ঘরেই চা... নেই, সবাই জানে। যদিই বা খানদশেক ভুয়ো রেশন কার্ড কেশববাবুর ঘরে থাকে, তিনি তো আর চাল চুরি করেন নি ; টাকা দিয়েই কেনেন ! মানুষের মৃত্যুর পর কি আর এসব কথা ওঠে ? আজকে দোষত্রুটি বিচার করবার দিন নয়, ভাই, মানুষটা কত মহৎ প্রাণ ছিল সেই কথাই শুধু ভাববো।

রুমাল দিয়ে তাঁকে চোখ মুছতে দেখে ছেলেরা একটু লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে সরে গেল।

দেখতে দেখতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচশো লোক জমে গেছে। গলির মুখের বড় রাস্তাটায় এরই মধ্যে জন চারেক উৎসাহী যুবক যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করেছে। বাড়ীর কর্তারা এতক্ষণ পরে যেন একটু কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন। কেশব চৌধুরীর এই অসাধারণ জনপ্রিয়তা স্বচক্ষে দেখে তাঁরা এত গভীর শোকের মধ্যেও গৌরব গর্ব বোধ করছিলেন।

ইতিমধ্যে হরিসংকীর্তন দলের কাছে শ্মশানযাত্রার ফরমাস গিয়েছিল, তারা কয়েকজন খোল-করতাল নিয়ে হাজির হয়েছে। ভিতর থেকে এক ধামা খই আর ছোট এক থলে ভাঙ্গানি পয়সা নিয়ে বাড়ির একটি ছেলে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। কেশবের বড় ছেলে গিয়ে চন্দন কাঠ আর গব্য ঘৃতের ব্যবস্থা করে এসেছে। এ পাড়ার বাজার খুব কাছে, গয়লা পাড়ার বস্তির গায়ে। সেখান থেকে এলো এক ধামা বাতাসা, মটর ডাল—ইত্যাদি। এবারে শবদেহ সবাই মিলে কাঁধে তুলতে হবে।

কিন্তু ভীড় কি সরানো যায়! জনসাধারণের ভিতর থেকে বহুলোক শবদেহের পায়ের কাছে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছে। ওর মধ্যে অনেকে এনেছে মালা, অনেকে এনেছে শ্বেতপদ্ম। অনেকগুলি মালার সঙ্গে কাগজের টুকরো লটকানো—তাতে কোন কোন সমিতির নাম লেখা আছে। আসছে কাল সকালে উক্ত সমিতির নাম খবরের কাগজে ছাপা হ'লে নিয়মিত চাঁদা তোলবার স্থবিধা হবে। শবযাত্রায় কে কে যাবেন, তাঁদেরও নামের তালিকা সংগ্রহ করা হচ্ছিল।

সন্ধ্যা তখন আসন্ন। বড় রাস্তা দিয়ে শব যাত্রা করা হবে, স্থতরাং পথের দুই ধারের বাড়ির জানালা খুলে গিয়েছিল। এখান দিয়ে যাবার সময় মহিলারা লাজ বর্ষণ করবেন। এইবারে যাত্রা করা দরকার, আর বিলম্ব করা চলে না। বাড়ির ভিতর থেকে নির্দেশ পেয়ে খোল-করতাল বেজে উঠলো। হরিসংকীর্তনের আওয়াজ তোলা হোলো। কেশব চৌধুরীর আত্মীয়েরা শবদেহ কাঁধে তুললেন। সবাই চীৎকার করলো, বল হরি হরি বোল!

এমন সময় কয়েকজন ছেলে এসে বললে, না তা হবে না। উনি ছিলেন জনসাধারণের আদরের লোক। উনি সকলের। আত্মীয়েরা ওঁকে কাঁধে নিতে পারবেন না। আমরাই নিয়ে যাবো,—এ আমাদের দায়িত্ব। আপনারা ছেড়ে দিন্।

সকলেই গর্ব অনুভব করলেন, এবং শবদেহসুদ্ধ খাট ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিলেন। এমন সময় একদল লোক এলো জাতীয় পতাকা নিয়ে, এবং শবযাত্রার সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলো জয় কেশব চৌধুরীর জয়! জয় হিন্দ! বন্দে মাতরম্!

পিছন থেকে আরেক দল গর্জিয়ে উঠলো দেখতে দেখতে। তারা ধ্বনি তুললো, ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

কেশব চৌধুরী জীবিত থাকাকালীন পাড়ায় পাড়ায় দলাদলিটা অনেকখানি চাপা ছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রতিক্রিয়াশীল দল এগিয়ে এলো। কয়েকজন পায়জামা পরা যুবক এবং গয়লা পাড়ার বস্তির দুটি শ্যামবর্ণা মেয়ে একখানা লাল পতাকা নিয়ে কেশব চৌধুরীর শবযাত্রার সঙ্গে এলোমেলো চীৎকার করতে করতে চললো। মোটামুটি হিসাব করলে দেখা যায়, অন্তত এক হাজার লোক চললো শ্মশানের দিকে।

কালী চাটুয্যে চোখ মুছে বললেন, তোমরা দেখে নিয়ো গোবিন্দ, আসছে কাল লাট সাহেব কেশবের বৌয়ের কাছে সমবেদনা জানিয়ে চিঠি পাঠাবেন। ব'লে রাখলুম।

গোবিন্দবাবু বললেন, একটা জ্যোতিষ্ক পতন হয়ে গেল!

আরেক জন বললে, পাড়াটা অন্ধকার! ঘরে ঘরে কান্না!

কালী চাটুয্যে আবার চোখ মুছে বললেন, কাঁদলে আর কেশব ফিরবে না, গোবিন্দ!

অন্ধকারে দরজায় বসে কে কাঁদে গা? ওমা, মেয়েছেলে দেখছি!

কালী চাটুয্যের সঙ্গে তিন চারটি লোক থমকে দাঁড়ালেন কেশব চৌধুরীর দরজায় কিন্তু অপরিচিত একজন মেয়েছেলেকে বসে কাঁদতে দেখে তাঁরা বললেন, কাঁদবেই ত, বনের পশুপক্ষীও কেঁদে যাচ্ছে! বলি, অ বাছা, কেঁদে আর কি হবে? যাও, বাড়ি যাও!

স্ত্রীলোকটি হঠাৎ মুখ তুললো। বললে, গরীবের কান্নার কথা তোমরা কেমন করে বুঝবে গা? আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল, আমাকে যে পথে বসিয়ে গেল!

আহা তা ত বটেই। কেশব ছিল যে গরীবের বন্ধু! দীন দুঃখীর মা-বাপ।

স্ত্রীলোকটি ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে উঠলো, থাক বাপু, তোমাদের ওসব মন ভোলানো কথা! মুখের কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না।

গলার আওয়াজটা যেন একটু ভিন্ন রকমের, গোবিন্দবাবু থমকে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, তোমার বাড়ী কোথায়?

দেখতে পাচ্ছনা বুঝি আমাকে অন্ধকারে? তোমরা ত সব চেনা মুখ গো! ওই ত' আমার ঘর গয়লা পাড়ার বস্তিতে? আমি যে মাছ বিক্রি করি, রোজ বাজারে গিয়ে দেখতে পাও না?

কালীবাবু বললেন, চলো হে চলো গোবিন্দ,—আমাদের নেত্য মেছুনী! তাই বলো। দুর্গা—শ্রীমধুসূদন! চলো।

নেত্য মেছুনী কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলো, গরীবের পয়সা মেরে তোমরা সবাই পালাতে পারলেই বাঁচো। কাল আমি ঘরভাড়া দিতে না পারলে রাখু গয়লা আমায় লাথি মারবে। বিটলে বামুনটা ধারে ইলিশ মাছ খেয়ে মরে গেল। কতবার আমার পয়সা মেরেছে, কিচ্ছু বলিনি। আজ সকালে এনেছে চার টাকা চার আনার ইলিশ মাছ, আর সেদিন ভাঙ্গড় মাছের দরুণ এক টাকা দশ আনা। আমার সর্বনাশ করে গেল, আমাকে কাল ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে গো। ওগো গরীবের পয়সা মারলে তোমাদের কারো ভালো হবে না গো।

নেত্য মেছুনী চীৎকার করছিল,—লোকটা ছিল নাকি ভদ্দরলোক, গরীবের মা-বাপ! এতই যদি ভালো, তবে বাজারের মেছুনীর পয়সা মারো কেন? মাছের দাম না দিয়ে গা-ঢাকা দাও কেন? এরা ভদ্দরলোক, এরা

বামুন, এরা পাড়ার মাতব্বর! পুলিশ ড্যাকো, আমি বলবো চেঁচিয়ে, ভয় করিনে কাউকে!

বাড়ীতে পুরুষ মানুষ আর কেউ ছিল না যে এসব কথার জবাব দেবে। কিন্তু একটা অত্যন্ত কদর্য দৃশ্যের অবতারণা হ'তে চলেছে বৈকি। এমন সময় ওই অন্ধকারেই ভিতর থেকে একজন মহিলা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। তিনি কেশবের সদ্যবিধবা স্ত্রী। দশটাকার একখানা নোট তাড়াতাড়ি বার ক'রে নেত্যর হাতে দিয়ে বললেন, এই নিয়ে যাও বাছা, কিছু মনে ক'রো না!

তিনি দরজাটা বন্ধ করার উদ্যোগ করতেই নেত্য বললে, চার টাকা দু'আনা তোমরা ফেরৎ পাবে, মা! এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

ফেরৎ আর কিছু চাইনে, তুমি দশ টাকাই নিয়ে যাও।— বলে কেশবের স্ত্রী দরজাটা বন্ধ ক'রে চ'লে এলেন।

বাইরে থেকে নেত্য তখন বলছে, তা হবে না মা,—নেয্য পাওনা নবো! আমরা কা'রো দান খয়রাৎ নিইনে। চার টাকা দু'আনা এনে দিচ্ছি— বলতে বলতে সে চ'লে গেল।

ভিতরে এসে দাঁড়াতেই একজন প্রবীণা মহিলা বললেন, হ্যাঁ গা সেজবৌ, মেছুনীমাগী মিছে কথা ব'লে টাকা নিয়ে গেল নাত'?

সেজবৌ শোকসন্তপ্ত মনে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, আমার স্বামীকে আমার চেয়ে আর কে বেশী জানে, পিসিমা?

পিসিমা সে কথা কানে না তুলে পুনরায় শোকের কান্না আরম্ভ করলেন।

দশ বছরের মেয়েটা গ্রামের মধ্যে ছিল অতিশয় কুখ্যাত। তা'র কীর্তিকলাপ দেখে সন্দেহ হোতো, দৈবাৎ সে মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। মেয়েটার ভাব ছিল ছেলেদের সঙ্গেই বেশী। পাড়ায় পাড়ায় চোর-চোর খেলে বেড়ানো, মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, হাডু-ডু খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, লুকিয়ে মাঠের আ'ল ভেঙে জল বের করে' দেওয়া, খালের ওপরকার বাঁশের সেতু ভাঙা—এইসব অকাজ আর কু-কাজে তা'র মস্তিষ্কও ছিল যেমন প্রখর, তা'র জুড়িও ছিল তেমনি কম। তা'ছাড়া পরের বাগানে অনধিকার প্রবেশ ছিল তা'র অবারিত; চুরি বিদ্যায় তা'র হাত ছিল অতি পাকা। অন্ধকারে বাগানে ঢুকে গাছ থেকে জামরুল পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে সে পড়েছে, হাত ভেঙেছে, গা ছড়েছে—কিন্তু সে ভ্রুক্ষেপও করেনি। নদীর খাঁড়িতে ঢুকে জেলেদের মাছের জাল কাটতে গিয়ে সে বেদম প্রহার খেয়ে এসেছে, এমন ঘটনাও দুর্লভ নয়। শরীরটা ছিল তা'র বেতের মতন শক্ত, হাত-পাগুলো মজবুত। মার খেয়ে তা'কে কাঁদতে দেখেনি কেউ, আছাড় খেয়ে পড়ে' কখনো সে কাৎরায়নি। সমস্ত গ্রামে তা'র নিন্দাটা ছিল প্রবল। সবাই বলতো, মেয়েটা এ গাঁয়ের ধূমকেতু।

তা'র প্রকৃতিগত নিষ্ঠুরতার জন্য ছেলেদের মধ্যেও কেউ তা'র অন্তরঙ্গ হ'তে ভরসা পেতো না—মেয়েছেলে ত' দূরের কথা। যে তা'র অতি নিকটে থাকতো, তা'র ওপরেই সে অত্যাচার চালাতো বেশী। হঠাৎ ঠেলে খালের জলে ফেলে দেওয়া, পুকুরের ডুব-জলে

কতক্ষণ ডুবিয়ে রেখে পেট ভরে' জল খাওয়ানো, গায়ে বিছুটি-পাতা ঘষে দেওয়া, কৌশলে ধুতরোর বিচি গেলানো—ইত্যাদি নানাবিধ আজগুবী এবং অভাবনীয় অনাচারে ছেলেদের কাছেও সে আতঙ্কের পাত্রী ছিল। অনেক সময় গা ঢাকা দিয়ে গ্রামের বারোয়ারি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে সে মাটির ঠাকুরের হাত-পা ভেঙে রেখে আসতো—একাজে কোনোদিন সে ধরা পড়েনি। তা'র পা দুটো ছিল সরু আর লম্বা—ছুটতে পারতো অসম্ভব।

চোখ দুটো ছিল তা'র নীল—একটু যেন বন্য। চুল ছিল মাথায় একরাশ—কিন্তু সেই চুলের রাশির ভিতরে কাঠি-কুটি, পোকা, ধুলো, —এমনভাবে জ'মে থাকতো যে সেই চুলের কোনো সংস্কার সম্ভব হোতো না। মা-বাপের অবহেলার পাত্রী ছিল সে, এবং বাড়ীতে কোনো সময়েই তা'কে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। সকাল সন্ধ্যায় দুটি খাওয়া, এবং রাত্রের দিকে যেখানে সেখানে প'ড়ে ঘুমিয়ে থাকা —এছাড়া বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারেই কম। তা'র দুরন্তপনা এবং নির্দয় আচার-আচরণ দেখেশুনে তা'র মৃত্যু কামনা করা ভিন্ন মা-বাপের আর কোনো উপায় ছিল না। কোনো একটা ভয়ানক অশুভ লগ্নে তা'র জন্ম—গ্রামের ভিতরে সকলেরই এই বিশ্বাসটা প্রবল ছিল। অনেক সময়ে অনেকে দেখেছে আঠাকাঠি দিয়ে গাছের আগডালে উঠে কোনো একটা পাখী ধরে' সে তা'র ডানা দুটো টেনে ছিঁড়ে পাখীটাকে মাটিতে ফেলে দিল। বিড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে মাঝপুকুরে ডুবিয়ে সে জন্তুটাকে মারতো। ঘুমন্ত কুকুরের গায়ে পাথর মেরে তা'র পাঁজর দিত ভেঙে। চৈত্র মাসে গিয়ে চাষীদের গোলায় সে দেশলাইর কাঠি ধরিয়ে দিয়ে আসতো।

বিষ

মেয়েটার নাম ছিল টুনি। দৈবাৎ মানুষের ঘরে তা'র জন্ম।

বছর চারেকের মধ্যে টুনি একেবারে বদলে গেল। তা'র সেই কঠিন তীক্ষ্ণ দেহটা কোন্ মন্ত্রবলে দেখতে দেখতে নধর হয়ে উঠলো, এবং হাত-পাগুলোয় এসে পৌঁছলো অস্বাভাবিক লাবণ্য। ময়লাধরা রুক্ষ গায়ের চামড়ার নীচে কোথায় ঘুমিয়ে ছিল তা'র রূপ, সেই রূপ বাইরে বেরিয়ে এলো জ্যোতির্ময় হয়ে। তা'র স্বভাবের নির্মমতা যেন কুয়াশার মত এক সময়ে মিলিয়ে গেল, এবং তা'র দুরন্তপনা যাদুর মতো যেন শান্ত হয়ে এলো। তারুণ্যের জোয়ার দেখা দিল তা'র অঙ্গে অঙ্গে।

টুনি ভদ্র সমাজের যোগ্য হবে, মানুষ হবে, বিয়ে হবে তা'র—এই অবিশ্বাস্য কথাটা গ্রামবাসীদের কল্পনার অগোচরে ছিল। কিন্তু সত্য সত্যই তা'র বিয়ে একদিন হোলো। অপ্রত্যাশিতভাবে তা'র পাত্র জুটে গেল।

সেই অঞ্চলে নদীর বাঁধ ভেঙে এসেছিল প্রবল বন্যা। রাতারাতি কত গ্রাম, কত মানুষ আর পশু ভেসে চলে' গেল তা'র সীমা রইলো না। টুনিদের বাড়ী আর তা'দের ঘর-খামারও রক্ষা পেলো না। জেলা সদর থেকে এসেছিল রিলিফ পার্টি। সেই দলের একটি যুবকের চেষ্টায় টুনিদের পরিবার সে যাত্রা বাঁচতে পারলো, এবং সেই ছোকরা টুনিকে দেখে ও তা'র সঙ্গে আচার-ব্যবহার করে' তা'কে পছন্দ করলো। ঘটনাটা সকলের কাছেই বিস্ময়জনক বৈ কি! টুনি প্রণয়াসক্ত হোলো।

ছেলেটির নাম অনন্ত। তা'র বাড়ী কলকাতায়, কিন্তু সে চাকরী করে বাঙ্গলার বাইরে কোন্ কয়লার খনি অঞ্চলে। ছুটি ছাটায় অনন্ত কলকাতায় যাতায়াত করে। বুড়ো মা বাপ আছেন বটে, কিন্তু তাঁরা উভয়েই রুগ্ন। মায়ের অম্লশূল, এবং বাপ বাত-ব্যাধিগ্রস্ত। তাঁদের

সেবার জন্য বিয়ে না করলেই নয়। সুতরাং প্রস্তাবটা উঠতেই মা-বাপ রাজী হলেন।

গ্রামে গিয়ে অনন্ত টুনিকে বিয়ে করে' নিয়ে এলো। ইতিমধ্যে বিবাহিত জীবনের কল্পনা টুনির মনে দানা বেঁধে উঠেছিল রূপকথার মতো। অনন্ত ছেলেটি ভালো, এবং এ বিয়ে অনেকটা গন্ধর্ব মতে এতে আর সন্দেহ কি? এই বিয়ের পটভূমিকায় ছিল গ্রামের বিস্তৃত আকাশ, অন্ধকার নদীকূল, দিগন্তজোড়া বন্যার প্রবাহ—এবং মৃত্যুর নৃত্যকলরোল। সুখের ও আতঙ্কের চেতনা ছিল অতি নিবিড়; সমগ্র স্নেহবঞ্চিত বাল্যকালের অপরিমেয় প্রাণের ক্ষুধাটা ছিল তীব্র ও সচেতন! সুতরাং টুনির মনে সুখের ও আনন্দের স্বপ্ন ফেনিয়ে উঠেছিল রসতরঙ্গের মতো। সুন্দর ঘরকন্না, মধুর আনন্দের আয়োজন, পুরুষের নিবিড় উত্তাপ, আকাশের অফুরন্ত কল্পনা! কিন্তু তাদের সেই গ্রামের অসীম উদার বিস্তার অতি ক্ষুদ্র হয়ে এসে ঢুকলো কলকাতার একটি অতি সঙ্কীর্ণ গলির পুরাতন একখানা তেতলা বাড়ীর নীচের তলায়। কালো, জল-ছলছলে নীচের তলায় টুনির বাসা বাঁধা হোলো।

এদিকটা শহরের পূর্বাঞ্চল, পাড়াটা তেমন ভালো নয়। চারিদিকে বস্তি, আশপাশে প'ড়ো মাঠ, গলির দুধারে নর্দমা। মাঝখানে এই ছোট গৃহস্থপল্লীর ভিতরে এই তেতলা বাড়ীটার নীচের তলাটা একটু অন্ধকার ও অস্বাস্থ্যকর। অনন্তর ইচ্ছা, কিছুদিনের মধ্যে তা'র মাইনেটা বাড়লে সে একটু ভালো জায়গায় গিয়ে দুখানা ঘর ভাড়া করবে, এবং তা'র সুন্দরী স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিয়ালদার পুরনো বাজার থেকে কিছু কিছু আসবাবপত্রও কিনে আনবে! অনন্ত এমন বউ পেয়ে খুব খুশী। বিশেষ করে' অমন শান্ত, সরল ও হাস্যমুখী স্ত্রী তা'র ভাগ্যে যে কী অদ্ভুত নিয়মে জুটে গেল, এটা খুবই বিস্ময়ের কথা। সে গিয়েছিল

কয়লা-কুঠির কুলী সংগ্রহের কাজে, ভাসলো বন্যায়—ঘরে এসে পৌঁছুল সুন্দরী বউ। একেই বলে ভাগ্যচক্র। ফুলশয্যার রাত্রে অনন্ত নিঃসাড়ে শুয়ে পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়ের কথা ভাবতে লাগলো, আর টুনি তা'র পাশে আলতাপরা পা দুখানি একত্রে জড়িয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে স্মিতমধুর মুখে রইলো ঘুমিয়ে। মাঝরাতে অনন্তর একখানা হাত তা'র ডান হাতখানায় এসে ছুঁয়েছিল, সেজন্য ঘুমের মধ্যেও নিবিড় রোমাঞ্চ কম্পনে তা'র সমগ্র প্রাণসত্তা অধীর ও অসংযত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু টুনি নাকি অত্যন্ত লাজুক, তাই জেগে উঠতে গিয়েও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে সে আবার চোখ বুজে রইলো। সে-রাতে দুটি স্বপ্ন জেগে রইলো পাশাপাশি।

দিন দুই পরে চাকরী-স্থানে চলে' যাবার আগে অনন্ত আদর করে' তা'র স্ত্রীর নাম রেখে গেল, মিঠু। বলে' গেল, আবার শিগগিরই ফিরবো, হয়ত কলকাতার আফিসে বদলী হয়ে আসবো। তখন নতুন বাসা ভাড়া করে' তোমাকে নিয়ে থাকবো। ততদিন তুমি মা-বাবাকে দেখো, মিঠু, লক্ষ্মীটি।

টুনি আড়ালে দাঁড়িয়ে তা'র স্বামীর পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। তা'র চোখ দুটো যেন বন্য হরিণীর মতো ছুটতে লাগলো অনন্তর পিছু পিছু।

অনন্ত চলে' যাবার পর প্রতি সপ্তাহে তা'র দুখানা করে' চিঠি আসতে লাগলো। তারপর একখানা—তারপর একমাসে একখানা। চিঠিতে ভালোবাসার কথা থাকে, কিন্তু আসবার কথা থাকে না। সাহেব ছুটি দিতে নারাজ, আফিসে লোক কম, এখন যুদ্ধের সময় ইত্যাদি। তবে ছুটি পেলেই যাবো, তুমি ভেবোনা মিঠু—তোমাকে নিয়ে কত

বেড়াবো, কত গল্প করবো। চিঠির মধ্যে একটি তরুণের ভাবী জীবনের সকল সুখস্বপ্ন সোনার অক্ষরে ফুটে থাকে।

এর পরে ভালোবাসার ভাষাটা এলো দুর্বল হয়ে। পুনরাবৃত্তির দোষে সেটার রং হয়ে এলো ফিকে। সান্ত্বনা দেওয়াটা হয়ে উঠলো হাস্যকর। তখন মাসে একখানা চিঠিও আসে কিনা সন্দেহ। টুনির হাতে কেবল রইলো ঘর আর বারান্দা, বারান্দা আর ঘর।

টুনি পল্লীগ্রামের মেয়ে, শিক্ষার পালিশটা তা'র কম। যে-সুসংস্কৃত মনোবৃত্তি উদার ধৈর্যের সঙ্গে আত্মসম্বরণ করে' প্রেমের শান্তরূপের তপস্যা নিয়ে বসে' থাকে, সেটি তা'র নেই—থাকার কথা নয়, এবং নেই বলে' সে দুঃখিতও নয়। সেই কারণে প্রথমদিকে চিঠির জন্য সে যেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো, পরের দিকে নিজের প্রতীক্ষার নির্লজ্জ দৈন্য লক্ষ্য করে' নিজের ওপর সে ভয়ানক বিরক্তও হয়ে উঠতো। আর যাই হোক, চিঠির পর চিঠি পাবার জন্য তা'র বিয়ে হয়নি, মাসের পর মাস পুরুষের আগমন প্রতীক্ষার জন্যও এই অন্ধ প্রেতপুরীতে সে এসে বাসা বাঁধেনি। মনে হোলো, তা'র বিরুদ্ধে এ যেন একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র। এটা নাকি কলকাতা শহর—সে শুনে এসেছে এখানকার লোক অত্যন্ত ধড়িবাজ, অতিশয় কুটিল। টুনি ভাবতে লাগলো, আর কিছু নয়, এ সমস্তই তা'কে ফাঁদে ফেলার জন্য আগের থেকে ব্যবস্থা করা। এই অন্ধকার নীচের তলাকার অস্পষ্ট ঘর, ওই বাতব্যাধিগ্রস্ত শ্বশুর, ওই রুগ্না স্বার্থপর শাশুড়ী—জীবনযাত্রার এই চারিদিক ঘেরা দারিদ্র্য—এই সব যা কিছু, সবই তা'কে তিলে তিলে দগ্ধ করার ফন্দী। টুনি অধীর হয়ে উঠলো।

একদিন শাশুড়ী বললেন, বৌমা, দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে নিন্দে হয়, জানো? এসব ভালো নয়!

টুনি বললে, কেন?

কেন! এত অজ্ঞান মেয়ে তুমি নও, বাছা। এটা তোমাদের পাড়াগাঁ নয় যে, লোকে তোমাকে সরল ভাববে। আর ওদিকে যেয়ো না। লোকের মুখে হাত চাপা দিতে পারবো না।

শাশুড়ীর শাসনটা ইদানীং যেন তা'র ভিতরে কেমন একটা কঠিন অন্তর্জ্বালার সৃষ্টি করে। কিন্তু টুনি কিছু বলে না, মুখ ফিরিয়ে চলে' যায়। অসন্তোষে ভরে' ওঠে তা'র পীড়িত মন।

আর একদিন শাশুড়ী বললেন, বৌমা, এমন দস্যি মেয়ে তুমি? নতুন কাপড়খানা ছিঁড়লে কেমন করে' শুনি?

টুনি বললে, দরজার কোণে আঁচল আটকানো ছিল, টানতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে!

শাশুড়ী বললেন, আজকাল একখানা কাপড়ের দাম কত জানো? কই, আগে ত' এমন ছিলে না তুমি? শ্বশুরের কানে উঠলে দেখো তিনি কি বলেন! একেই ত খিটখিটে মানুষ!

টুনি গ্রাহ্য করলো না, অন্যদিকে চলে' গেল। শাশুড়ী তীব্র দৃষ্টিতে তা'র দিকে চেয়ে রইলেন।

নিজেকে টুনির অদ্ভুত লাগছে। সে এমন ছিল না কোনোকালে। কেউ তা'কে শাসন করেছে, লাঞ্ছনা করেছে, বশ্যতা স্বীকার করিয়েছে —আর সে মুখ বুজে সমস্তটা মেনে নিয়েছে, এ তা'র জীবনে অভিনব। সে ছিল সমস্ত গ্রামের আতঙ্কের পাত্রী, সে যা'কে বিরূপ মনে করতো, সে অক্ষত থাকতো না। সে অনাদৃত, উপেক্ষিত ছিল,—সে আত্মীয়-পরিজনের মাঝখানে স্নেহবঞ্চিত বাল্যকাল যাপন করে' এসেছে, একথা সত্য, কিন্তু নিজেকে সে সহজে ছড়িয়ে দিতে পারতো গ্রামের উদার বিস্তারের মধ্যে। তা'র আকাশ ছিল অসীম, তা'র ধানক্ষেত ছিল আনন্দের লীলাক্ষেত্র, তা'র গ্রামের পথঘাট, নদীতীর, জেলেদের পাড়া,

বাউরীদের তালপুকুর, গয়লাদের ঘর—এ সমস্তই ছিল তা'র প্রাণ-কল্লোলে মুখরিত। এখনো সেই গ্রামের সর্বত্র এই সহস্র সহস্র পায়ের চিহ্ন বুকে নিয়ে যেন তা'রই বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর। তা'দের সেই কুটীর প্রাঙ্গণে দোয়েল পাখী হয়ত আজো যায়, আজো নদীর খাঁড়িতে উজ্জ্বল মাছগুলি ভেসে আসে, বাগানের কচি ফলগুলি নব চেতনায় শিউরে ওঠে, কাজলপরা চোখগুলি নিয়ে গ্রামের গরুগুলি তা'দের ঘরের দিকে চেয়ে-চেয়ে আজো হয়ত মাঠে চলে যায়—কিন্তু টুনি তা'দের মধ্যে আজ কোথাও নেই! তা'র কচি প্রাণখানি সমগ্র গ্রামখানিকে আঁকড়ে ধরে' এই চিরান্ধকার প্রেতপুরীর নিঃসঙ্গ মলিন শয্যায় শুয়ে যেন ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে। সেই অনাথা বালিকার জীবন অনেক ভালো ছিল, কিন্তু এই অপমানিত বন্দিনীর জীবন মুক্তির পিপাসায় দিন দিন যেন আত্মদ্রোহিতায় মেতে উঠলো।

অনন্ত যাবার সময় তা'কে একটা লালমোহন পাখী এনে দিয়ে গিয়েছিল। টুনি স্থির করলো, পাখীটাকে উড়িয়ে দিতে হবে। বারান্দার ধারে গিয়ে সে দাঁড়াতেই পাখীটা তা'কে দেখে আনন্দে উৎসাহে পাখা ঝটপট করে' উঠলো। টুনি কাছে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে লোহার খাঁচার দরজাটা দিল খুলে। পাখীটা তৎক্ষণাৎ খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু চারিদিকে দেওয়াল দেখে প্রথমটা সে হকচকিয়ে গেল। নীচের তলা থেকে ঝটপটিয়ে উড়ে বসলো দোতলায়, সেখান থেকে তেতলার বারান্দায়। তারপর তা'র চোখে পড়লো উপরতলাকার আলো, আলোর পথ ধরে' সে খুঁজে পেলো আকাশের একটা টুকরো। পাখীটা সেই দিক লক্ষ্য ক'রে ডানা বিস্তার করে' উড়ে গেল। টুনি উপরদিকে চেয়ে দেখলো এক ফালি আকাশ তা'র অতৃপ্ত অশান্ত প্রাণের ক্ষুধা জাগিয়ে যেন দূরের থেকে তাকে পরিহাস করছে!

বিষ

বৌমা—অ বৌমা—

শাশুড়ীর অধীর ও উগ্র চীৎকারে টুনির চমক ভাঙলো। সহসা ছুটে গিয়ে সে বললে, কি বলছেন— ?

ওই-ওই দেখো বেড়ালের কাণ্ড! জ্যান্ত কৈ মাছটা নিয়ে ওই পালালো,—কোনোদিকেই কি তোমার চোখ নেই গা? বুড়ো শ্বশুরকে আজ কী দিয়ে ভাত দেবে বল দেখি?—শাশুড়ী দুম দুম করে' চলে' গেলেন।

পলকের জন্য টুনি একবার দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালো। দেখতে দেখতে তা'র সেই পুরাতন হিংস্র রক্তটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতায় টগবগিয়ে উঠলো। সহসা রান্নার খুন্তিখানা নিয়ে সে গেল এগিয়ে, এবং সজোরে সেই মেনি বেড়ালটার পিঠের উপর দিল বসিয়ে। শাশুড়ী ফিরে আসছিলেন, হঠাৎ এই দৃশ্যটা দেখে হাউমাউ ক'রে উঠলেন—কী করলে, কী সর্বনাশ করলে, বৌমা? ও যে ষষ্ঠির বাহন! মেরে খুন করলে,—ওমা, কেটে যে দুখানা হয়ে গেল! একেবারে রক্ত গঙ্গা!—ওগো, কোথা গেলে তুমি? ওগো, শুনছো— ?

শ্বশুর মশায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। বিড়ালটা তখন মৃত্যুর আগে রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছে।

টুনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসছিল।

শ্বশুর মশায় কাঁপতে কাঁপতে এক জায়গায় বসে' পড়লেন! তাঁর গলা শুকিয়ে উঠলো। শাশুড়ী চীৎকার করে' বললেন, এমন খুনে মেয়েকে অনন্ত ঘরে আনলো গো? এ কি সর্বনেশে কাণ্ড।

টুনি বললে, একটা বেড়াল মেরেছি তা কি? অমন করছেন কেন আপনারা? মরেছে বেশ হয়েছে!

কে ওকে এখন তুলবে শুনি?

কেন? আমিই তুলে ফেলে দিয়ে আসছি। রক্তটা মুছে নিলেই ত' হবে। আপনাদের সব বাড়াবাড়ি।

শাশুড়ী বললেন, আর খুন্তিখানা? ওই খুন্তি কি আর নেবো ঘরে?

ভারি একখানা খুন্তি!—বলে' টুনি চলে' গেল।

বুড়ো শ্বশুর এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাকলেন, বলি, শুনছ?

শাশুড়ী জবাব দিলেন, কি গা?

অনন্তর পাখীটা উড়ে পালালো কখন্?

শাশুড়ী বেরিয়ে এসে বললেন, ওমা তাইত, খাঁচাটা যে খোলা?—বলি, হ্যাঁ বৌমা—বৌমা, শুনছ?

টুনির আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বন্য নীলাভাস আবার ফিরে এলো টুনির চোখে। ভিজা আবাঁধা চুলের রাশির মধ্যে আবার পোকায় বাসা বাঁধলো। মুখের রেখাগুলি হয়ে এলো কঠিন, চেহারাটা হোলো রুক্ষ।

অনন্তর চিঠি আসে অনিয়মিত, কিন্তু তা'র জবাব দেবার সময় টুনির আর হয়ে ওঠেনা। শ্বশুর শাশুড়ী তিরস্কার করলে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালে নখ খুঁটতে থাকে—যতক্ষণ না নখের ডগা থেকে রক্ত বেরোয়। রাঁধতে বললে তরকারীতে হুন দিয়ে বসে এক খাবলা—সেই তরকারী খেয়ে অম্লরোগী শাশুড়ীর গলা জ্বলে যায়। উনুন থেকে দুধ উতলে ঝিঁকের ওপর গড়িয়ে পড়ে—দেখে তা'র আমোদ লাগে। শাশুড়ী তাই দেখে আজকাল খোলাখুলি ভাষায় গালমন্দ করতে বসেন।

অনন্ত গতমাসে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, এমাসের পনেরো তারিখের মধ্যে ছুটি নিয়ে সে আসবে। কিন্তু সেই পনেরো তারিখ কবে পেরিয়ে গেছে, তার দেখা নেই। বাপের বাড়ী থেকে মাস তিনেক আগে

একখানা চিঠি এসেছিল—টুনি কেমন আছে—কিন্তু সে চিঠির জবাবও দেওয়া হয়নি, তারপরে আর চিঠিও আসেনি। আলো-বায়ুহীন নীচের তলাটার জলে-জলে সারাদিন ঘুরে টুনির দুই পায়ে হাজা ভরে' গেছে! চারিদিকের দেয়াল বাঁধা এই অন্ধ গুহার ভিতরে থেকে তা'র সুন্দর ও নধর মুখে চোখে কেমন যেন ধূসর বিবর্ণতা দেখা দিয়েছে।

তা'র খেয়াল গেল, শাশুড়ীকে সে সর্বপ্রকারে জব্দ করবে। শাশুড়ীর খাবার দুধে সে হলুদ বাটা ফেলে দিল, পানের কৌটো লুকিয়ে রাখলো, গোপনে তাঁর খাদ্যে বালির চাপড়া মিশিয়ে দিল, কেরোসিন ঢেলে-দিল তাঁর বিছানায়। শাশুড়ী চেঁচিয়ে কেঁদে গাল দিয়ে হাট বাধাতে লাগলেন! টুনি খুশী হয়ে কলতলায় গিয়ে বসে' মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগলো। তা'র একমাত্র চেষ্টা হোলো, এই ক্ষুদ্র গৃহস্থটির জীবনযাত্রাকে সর্বপ্রকারে দুরূহ করে' তোলা। একাজে সে বিশেষ মজবুত।

শ্বশুর বলে' দিয়েছেন, আমার ঘরে তুমি ঢুকোনা, বৌমা।

কেন?

আমার খুঁটিনাটি জিনিসপত্র চারিদিকে ছড়ানো থাকে তাই বলছি। আমার খাবার ওষুধের সঙ্গে বাতের মালিশ মিশিয়ে দিলে আর আমাকে বাঁচতে হবে না। আমার আফিঙের কৌটো সেদিন তুমিই লুকিয়ে রেখেছিলে, আমি বেশ জানি—কচি খোকা নই।

টুনি হেসে বললে, আপনি আফিং খান্ কেন?

তা'তে তোমার মাথা ব্যথার কী দরকার বৌমা? আফিং খাই—ঘুম হয়, নেশা হয়—শরীর মন ভালো থাকে! তাই খাই।

কিন্তু ও ত বিষ!

শ্বশুর বললেন, মাত্রা বুঝে খেতে হয়।

টুনি চুপ করে' গেল। শ্বশুর বললেন, তুমি যাও, বৌমা। আজ আমার বাতের মালিশের দরকার নেই। তুমি ভাল মানুষের মেয়ের মতন একটু শান্ত হয়ে শাশুড়ীর কাজ করো গে। কাল থেকে ওঁর শূল বেদনা বেড়েছে, তুমি যেন এখন আর দৌরাত্ম্যি ক'রো না। অনন্ত ফিরলে তা'র হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে আমাদের ছুটি। ধন্যি মেয়ে বাবা তুমি!

টুনি চলে' গেল নিঃশব্দে। বিরক্ত চক্ষে তা'র দিকে একবার তাকিয়ে শ্বশুর মশায় হিসাবের খাতাটা টেনে নিলেন।

ইদানীং অনন্তর কোনো চিঠিপত্র আসেনি। স্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে ঠিকমতো জবাব পায়না, হয়ত সেই কারণে তারও চিঠিপত্র লেখার উৎসাহ কমে গেছে। সে স্থির করেছিল, একেবারে কাছে গিয়ে সে স্ত্রীর অভিমান ভাঙাবে। বহুদিন ধরে' সে আশ্বাস দিয়ে স্ত্রীকে ভুলিয়ে রেখেছে, নিজেও সে ইন্দ্রজাল বুনেছে প্রবাসে থেকে—এবার গিয়ে সকল অন্যায়ের প্রতিকার করবে সে। তা'র মাইনে বেড়েছে, এই চমকপ্রদ খবরটা সে চেপে রেখেছে—এবার গিয়ে সোল্লাসে সেটা সে ঘোষণা করবে। সুতরাং অনেক তদ্বির তদারক এবং অনেক উমেদারি করে' সে আগামী সপ্তাহ থেকে একমাসের ছুটি সাহেবকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নিল। সাহেব তা'র কাজে খুশী হয়ে বললেন, তোমাকে কলকাতার আফিসে আসছে মাসে বদলী করব কিনা, ভেবে দেখবো। ইতিমধ্যে গিয়ে নবপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হও।

অনন্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে কলকাতা রওনা হোলো তার পরের সপ্তাহে। দিনান্তের সারসপক্ষী যেমন সুদীর্ঘ আকাশ পেরিয়ে অন্ধের মতো বাঁসার দিকে ছোটে, অনন্ত তেমনি ছুটলো রেলপথে। গাড়ী চলবার পর তা'র মনে হোলো, সুবিধা থাকলে ট্রেনের চেয়েও অধিকতর দ্রুতগতিতে সে ছুটে যেতে পারতো!

বিষ

বাসায় এসে অনন্ত যখন পৌছুলো তখনও সন্ধ্যা হয়নি। আসবার আগে সে চিঠি দেয়নি। সুতরাং মনে করেছিল বাড়ীতে হঠাৎ দেখা দিয়ে আনন্দের একটা ঝড় বইয়ে দেবে সে। সেইজন্য বাসায় ঢুকলো সে পা টিপে টিপে। স্টেশন থেকে ফিরবার সময় বাজার থেকে সে কিনে এনেছে একরাশ ফুল। ভেবে রেখেছিল আজ নতুন করে' আবার একটা ফুলশয্যায় টুনিকে ফুলের অলঙ্কারে সে মনের মতন করে' সাজিয়ে দেবে! একখানা নতুন শাড়ীও ছিল তা'র ঝোলায়। সদর দরজা পেরিয়ে সে ভিতরে ঢুকলো। কলতলা পেরিয়ে গেল সে ঘরের দিকে। কিন্তু মাঝপথে সে থমকে দাঁড়ালো। শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় দুটি ভদ্রলোক চিন্তিত মুখে বসে রয়েছেন। অনন্ত বললে, কে আপনারা ?

আপনিই কি অনন্তবাবু ?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

লোক দুটি বললে, আমরা ডাক্তার বাবুর এসিস্ট্যান্ট্। ডাক্তার বাবু ঘরে আছেন, আপনি ভেতরে যান।

অনন্ত বিদ্যুতের মতন ঘরে ঢুকলো। মা ছিলেন বসে'—হাউমাউ করে' চেঁচিয়ে উঠলেন, বাবা আর্তনাদ করলেন। ওপাশে ডাক্তার বসে' রয়েছেন টুনির বাঁ হাতখানা হাতে নিয়ে। টুনি বিছানায় মধ্যে অচেতন ও অসাড়।

অনন্ত বললে, ব্যাপার কি ?

ডাক্তার বললেন, এখনও ঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না। শুনছি নাকি বেলা চারটে থেকে হঠাৎ মেয়েটির এই অবস্থা হয়েছে, জ্ঞান ফিরছে না।

তা'র মানে ?

ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললেন, শরীরে কোনো অসুখের লক্ষণ নেই,

সর্দি, কাশি, জ্বর—কিছুই নেই। কিন্তু রোগী সিঙ্ক্ করছে মনে হচ্ছে, ঘণ্টাখানেক পরে আর বোধ হয় রোগী বাঁচবে না।

বাঁচবে না!—অনন্ত যেন আর্তনাদ করে' উঠলো বুকফাটা কান্নায়।

বাইরের থেকে এসিস্ট্যাণ্ট্ দুজন ঘরে এসে দাঁড়ালো। বললে, স্যর, কেমন দেখছেন এখন?

ডাক্তার বললেন, অত্যন্ত রহস্যজনক মনে হচ্ছে! এপোপ্লেক্সি নয়, হার্টের ব্রেক-ডাউন নয়—অথচ সতেজ রোগী আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে চলেছে। এত তাড়াতাড়ি চলেছে যে, জানিনে আর কতক্ষণ রাখতে পারবো!

মা ও বাবা মুখে কাপড় চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনন্ত বলে' উঠলো, তবে কি কোনো উপায় নেই ডাক্তারবাবু?

আমি অত্যন্ত দুঃখিত, অনন্তবাবু। ডাক্তারবাবু রোগীর নাড়ি ছেড়ে দিয়ে নত মুখে বসলেন।

হারিকেনটা টিপ টিপ করে' জ্বলছে। সেই আলোয় অবরুদ্ধ বাতাসের মধ্যে অনন্ত গিয়ে বসলো টুনির পাশে। রোগীর স্বাস্থ্যে কোথাও শীর্ণতা নেই, রুগ্নতা নেই। ঘুমে সে অসাড়, চোখের কোল দুটো কা[illegible], হাতের তালু দুটি বিবর্ণ, নাকের নিশ্বাসটি স্তিমিত। অনেকক্ষণ অনন্ত স্তব্ধভাবে বসে' রইলো। তারপর এক সময়ে বললে, ডাক্তার বাবু—?

কি বলুন?

ক্ষমা করবেন, একটা কথা বলবো। মেয়েটি বড় দুরন্ত, কিছু খায়নি ত? মানে—বিষ-টিস কিছু?

ডাক্তারবাবু তা'র প্রস্তাবে সহসা সচকিত ও সজাগ হয়ে বসলেন। বললেন, চেষ্টা করে' দেখতে পারি।

—ওহে সন্তোষ—

একজন সহকারী এসে দাঁড়ালো। ডাক্তার বললেন, আমার চেম্বার থেকে শিগগির একবার স্টম্যাক পাম্প্‌টা আনো ত! দৌড়ে যাও—অবিশ্যি বিষ-টিস কিছু খাবার কথা আমার আগে মনে হয় নি।

সন্তোষ চলে গেল, এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই ঔষধপত্র সমেত সাজসরঞ্জাম নিয়ে এলো। ডাক্তার বললেন, তোমরা বাইরে থাকো। আমি অনন্তবাবুকে নিয়েই কাজ করতে পারবো।

যন্ত্রের সাহায্যে অচেতন রোগীর মুখগহ্বরকে বড় ক'রে তুলে ভিতরে নল চালিয়ে দেওয়া হোলো। অনন্ত টুনিকে ধরে' বসে' রইলো।

পাম্প করতে করতে নানা পদার্থ উঠলো। কিন্তু ডাক্তার এক সময়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি আগে কিছু জানতেন?

অনন্ত বললেন, কি বলুন ত?

আপনার স্ত্রীর ওপর কি উৎপীড়ন করা হোতো?

আজ্ঞে সে কি কথা? আমার মা আর বুড়ো বাবা ছাড়া এবাড়ীতে আর কেউ নেই। তাছাড়া আমার স্ত্রী ওঁদের খুবই প্রিয়!

ডাক্তার ইংরেজিতে আরো দুচারটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন। অনন্ত জবাব দিল, ওসব কিছুই নয়, এই আমার ধারণা, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার পাম্প্ করতে করতে বললেন, আপনি নিশ্চয় অবাক হবেন শুনে, আপনার স্ত্রী আফিং খেয়েছেন! কিন্তু বিপদের কথা হোলো এই, সেই আফিং আর উঠবে না—অনেকখানি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

অধীর উদ্বেগে অনন্ত পুনরায় আর্তনাদ করে' উঠলো, তা' হলে এখন কি উপায় ডাক্তারবাবু?

উপায় কিছু নেই। সত্যি বলতে কি, রোগীর নাড়ির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। অবিশ্যি তখনি তখনি জানলে এতটা বিপদের আশঙ্কা থাকতো না। আফিং উনি কোথায় পেলেন?

বাবা আফিং খান্!—অনন্ত নতমুখে বললে।

এমন সময় ব্যস্ত ভাবে বাবা এসে বললেন, আমি আগে কিছুই জানতে পারিনি, ডাক্তারবাবু! এই এখন…এই যে কৌটো খুলে দেখছি আমার কৌটো খালি। আধ ভরি আফিং ছিল এতে!

আধ ভরি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু!

আচ্ছা আপনি যান—কী হয় দেখা যাক্। এই বলে' রোগীর অবস্থার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার নাড়ি ধরে' বসে' রইলেন। এক সময় বললেন, নাড়ি এখন আর সিঙ্ক্ করছে না তাড়াতাড়ি। তবে 'কোমা' অবস্থা!

অনন্ত বললে, তবে কি আশা আছে কিছু?

বলা কঠিন।—এই বলে' তিনি রোগীর গায়ে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, ওমা—মাগো, শুনছ মা?

রোগী নিমীলিত দৃষ্টিতে একবার তাকালো অর্থহীন ভাবে। তারপর আবার গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো। ডাক্তার বললেন, এই ঘুমটাই বিপজ্জনক, কারণ এ-ঘুম আর নাও ভাঙতে পারে। একে যে-কোনো উপায়ে জাগিয়ে রাখতে পারলে হয়ত কিছু আশা দেখা যেতো। দেখছি বিষটা রক্তে অনেকখানি মিশে গেছে!

অনন্ত বললে, জাগিয়ে রাখার কি কোনো ওষুধ নেই?

কোনো ওষুধই এখন খাটবে না, অনন্তবাবু। তবে যদি খুব একটা শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে জাগিয়ে রাখা যায়, সে এক কথা। কিন্তু…এই দেখুন না—গায়ের চামড়ায় কোন চেতনা নেই।—এই বলে' ডাক্তারবাবু টুনির নরম নধর হাতের উপর একটা প্রবল চিমটি কাটলেন। আঙুলের দাগ বসে' সে-জায়গাটা নীল হয়ে উঠলো, কিন্তু টুনি কোনো সাড়া দিল

না। আঘাতের চিহ্নটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে অনন্তর চোখ দুটো সজল হয়ে এলো। ডাক্তারবাবু বললেন, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, অনন্তবাবু। আপনি কি পারবেন একাজ? অবিশ্যি কাজটা খুবই ডেলিকেট্ —মানে স্বামী হয়ে…

এই বলে' ডাক্তারবাবু তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে উঠলেন। বললেন, এর আর কোনো প্রতিকার নেই! দেখুন, যদি কিছু করা যায়। অবিশ্যি এ খবরটা বাইরে জানাজানি হ'লে আপনাদের অসুবিধে হ'তে পারে। সে যাই হোক—আমি চললুম এখন…যদি মনে করেন রোগীর অবস্থা ভালো তবে আমাকে শেষ রাত্রের দিকে একটা খবর দিতে পারেন। নৈলে… ভগবানই ভরসা! আচ্ছা নমস্কার।

ডাক্তার তাঁর সহকারীদের নিয়ে বিদায় নিলেন।

উপরতলাকার কোন্ ঘড়িতে ঢং ঢং করে' যেন রাত ন'টা বাজলো।

অনন্তর দুই চোখ ভরে' জল এসেছিল। সে উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো। মা-বাবা রইলেন বাইরে। আলোটা টিপটিপে করে' সে রেখে এলো ঘরের কোনে। পূব দিকের জানালাটা দিয়ে পরিপূর্ণ শুক্লপক্ষের এক ফালি ভীরু জ্যোৎস্নার ঝলক এসে পড়েছিল জানালায়। টুনির মাথার কাছে অনন্ত এসে দাঁড়ালো। মৃত্যুর ছায়ায় রোগীর সর্বাঙ্গ অসাড় ও অচেতন। কিন্তু জ্যোৎস্নার আভায় টুনির বিলোল মাদকবিহ্বল দেহখানি আগেকার মতোই ঢলঢল করছে! কোন্ নিবিড় অন্ধ অতলের তলায় সে আজ ডুব দিয়েছে কে জানে, কিন্তু তা'র সমগ্র সুকুমার 'দেহ-লতায় লেখা রয়েছে যেন অনন্তর কত দিনের কত সোনার স্বপনের কাহিনী। মৃণালের বৃন্তে যেমন ফুটে থাকে রক্তকমল দল, তেমনি মৃত্যুর বোঁটায় যেন টুনি বিকশিত হয়ে রয়েছে নিঃসাড় হয়ে—হয়ত আজ রাতেই সে খসে'

যাবে। বন্যার স্রোতে অনন্তর জীবনে ভেসে এসেছিল এই ফুল, কিন্তু মৃত্যুর প্রবাহ তা'কে স্থির থাকতে দিল না।

অনন্তর দুই চোখে জলধারা বইল অনেকক্ষণ।

এমন সময় সজাগ হয়ে সে টুনিকে একটা নাড়া দিল, কিন্তু টুনির কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ভীত হয়ে সে আবার একটা ঝাঁকুনি দিল, টুনি সামান্য নড়ে' উঠে পুনরায় তখনই স্থির হয়ে গেল! আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বের মধ্যে অনন্ত তা'র হাত ও মাথাটা ধরে' একবার উপর-দিকে তোলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু প্রবল মাদক প্রভাবে রোগী একেবারে বেহুঁস। অতঃপর ডাক্তারের অনুকরণ করে' সে রোগীর দেহের একটা নরম জায়গায় প্রবল ভাবে চিমটি কাটলো—তবু সাড়া নেই। মাত্র একটু নড়ে ওঠে, সামান্য গলার আওয়াজ করে, তারপর আবার নিদ্রায় অচেতন হয়ে যায়।

টুনি? মিঠু?

টুনি কোন্ এক রহস্যলোকে মগ্ন। হয়ত তা'র প্রাণসত্তা আপন দেহখানিকে অতিক্রম করে' গিয়ে বিচরণ করছে সেই বাল্যকালের গ্রামের পথে পথে, সেই অবারিত প্রান্তরে, সেই নদীতীরের বিজন বনে—যেখানে উদার মুক্তি, যেখানে অবাধ সূর্যালোক, যেখানে অপরিসীম—আনন্দের লীলা নিকেতন। আতঙ্ক ও উদ্বেগে অনন্ত অধীর হয়ে উঠলো।

ডাক্তারের প্রস্তাবটা তা'র সহসা মনে পড়ে' গেল। শারীরিক যন্ত্রণা দিলে হয়ত রোগীর বাঁচার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অনন্তর মনে হোলো, নিজের হাতে বরং এই সোনার বরণ রাজকন্যাকে চিতাগ্নিশিখার উপর তুলে ধরা যায়, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণা দেবে সে কোন্ হাতে, কোন্ প্রাণে? অথচ সময় নেই—ঘড়ির কাঁটা অবিরাম ঘুরে ঘুরে মৃত্যুর পদধ্বনির সঙ্কেত

জানাচ্ছে—স্নেহের চিত্ত-আলোড়ন এখন ত' আর সম্ভব নয়। অনন্তর ভিতর থেকে যেন নিষ্ঠুর পুরুষ বেরিয়ে এসে বলতে লাগলো, উৎপীড়ন করো, যন্ত্রণা দাও, বাঁচাও!

অনন্ত তা'র শক্ত বাহু বাড়িয়ে টুনির চুলের মুঠি ধরলো, এবং অন্য হাতে একখানা হাত মোচড়াতে লাগলো। টুনি একটা কাতরোক্তি করে' উঠলো। কিন্তু প্রবল নিদ্রার জটিল জাল ছিঁড়ে সে বেরিয়ে আসতে পারলো না। অনন্ত ভাবলো, পুরুষের অতি লঘু করাঙ্গুলি স্পর্শে কি নারীর চেতনাকে অতি নিবিড় যন্ত্রণায় অধীর করে' তোলে না? চিন্তামাত্র অনন্ত টুনির দেহের আচ্ছাদন সরিয়ে নিল। তারপর অতি মৃদু, অতি সূক্ষ্ম অঙ্গুলি স্পর্শের দ্বারা টুনির সেই ললিত লাবণ্যলতার উপরে মধুরতম নিবিড়তম যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে লাগলো। কিন্তু কোনো সুফলই ফললো না—দেহের উপরকার ত্বক্ যেন প্রাণহীন!

বাইরের দরজায় মায়ের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। অনন্ত উঠে গিয়ে বললে, তোমরা ওঘরে থাকোগে মা, দেখা যাক্ কী হয়।

বৌমা বাঁচবে ত?

দেখতেই পাবে মা!—ব'লে অনন্ত এবার দরজাটা বন্ধ করে' দিল। কিন্তু দরজা বন্ধ ক'রেই তা'র মনে হোলো, এখনো সে যথেষ্ট কঠিন হ'তে পারে নি। এখনো তা'র মনে আছে দয়া, স্নেহ, প্রেম, বিবেচনা—এখনো সে স্ত্রীর প্রতি অন্ধ। কোথায় তা'র সেই নির্মম পৌরুষ, কোথায় সেই দয়াহীন দস্যুমনোবৃত্তি—যে নিষ্ঠুরতা মৃত্যুর গ্রাস থেকে অমৃতকে ছিনিয়ে আনতে পারে? কোথায় তা'র সেই প্রেম—যে প্রেম অকল্যাণকে বিনাশ করে' সংহার মূর্তি ধরে, যে প্রেমের ভীষণতম রূপ মৃত্যুকেও আতঙ্কিত করে' বিদূরিত করে? অনন্ত শান্ত হস্তে ঘরের কোণ থেকে একটি বেতের ছড়ি সংগ্রহ করে আনলো। তারপর, দেবলোকদুর্লভ

যে তনুলতাটিকে অলঙ্কৃত করে' সে আজ রাত্রে পুষ্পশয্যা রচনা করা কল্পনা করেছিল, সেই দেহখানির উপর সপাৎ করে' আঘাত হানলো রোগী চঞ্চল হয়ে নড়ে' উঠলো। কী উল্লাস অনন্তর চোখে মুখে! কী আগ্রহ তা'র দুই বাহুতে! আবার সে সপাৎ করে' টুনির গায়ে বেত মারলো প্রবল শক্তিতে। টুনি কাৎরে উঠলো, অনন্ত আবার মারলো যন্ত্রণায় টুনির শরীর কুঁকড়ে উঠলো, কিন্তু অনন্ত থামলো না—অন্ধের মতো সপাসপ মারতে লাগলো তা'র সর্বশরীরে। টুনি বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো বিছানার উপর ওলোটপালট খেতে লাগলো। শিকারের ওপর হিংস্র দাঁত বসিয়ে বন্যজন্তু যেমন পরম উৎসাহে তা'র যন্ত্রণাটা উপভোগ করতে থাকে, অনন্ত ঠিক তেমনি জলজলে চোখে টুনির দিকে তাকিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠলো।

টুনি বিছনার উপর উল্টে পাল্টে গোঁ গোঁ করছে। বেতখানা রেখে দিয়ে অনন্ত তা'র কাছে সরে' গেল। দেখলো টুনির বন্ধ দুই চোখে যন্ত্রণার উত্তপ্ত অশ্রুধারা। মনে হোলো সর্বাঙ্গে তা'র ঘাম ফুটেছে। কিন্তু তা'র গায়ে হাত বুলিয়ে অস্পষ্ট আলোয় অনন্ত বুঝতে পারলো, ঘাম নয়,—কোমল দেহলতাটি বেতের আঘাত সইতে না পেরে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু চিত্তবিকার ঘটলে অনন্তর চলবে না। আত্মসম্বরণ করে' সহসা অনন্ত তা'র সেই রক্তমাখা হাতে টুনির কচি গালের উপর ঠাস ঠাস করে' কয়েকটা চড় বসিয়ে দিল। টুনি এবার উৎপীড়নের ফলে জেগে উঠে বসলো, বসে' কেঁদে ফেললো।

অনন্ত সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। সে টুনির দুখানা হাত ধরে' বিছানা থেকে নামিয়ে হিঁচড়ে টানতে লাগলো। কিন্তু রোগীর পায়ে শক্তি নেই যে, উঠে দাঁড়ায়। অনন্ত তা'র মাথাটা দুই হাতে ধরে' দেওয়ালের গায়ে ধাঁই করে' ঠুকে দিল। টুনি দাঁড়ালো সোজা হয়ে!

অনন্ত তা'কে হিঁচড়ে হিঁচড়ে ঘরময় হাঁটাতে লাগলো, কিন্তু আবার ঘুমে টুনি এলিয়ে পড়তে লাগলো অনন্তর দুই বাহুর মধ্যে। অনন্ত তা'র চুলের মুঠি ধরে' হেঁচকা দিয়ে একমুঠো চুল সজোরে ছিঁড়ে নিল। টুনি আর্তনাদ করে উঠে এবার জড়িত কণ্ঠে বললে, কেন মারছো আমাকে এমন করে' ?

চোখের জল চেপে অনন্ত ধরা গলায় বললে, তোমার চেয়ে আমি বেশী মার খাচ্ছি, মিঠু !

টুনি বোধ হয় অনন্তর কথা শুনতে পেলো না। অনন্ত তা'কে আবার হিঁচড়ে হিঁচড়ে ঘরময় হাঁটাতে লাগলো। যতবার সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, ততবারই অনন্ত নতুন নতুন পীড়নের কৌশল খুঁজে বা'র করে। কখনো টুনির আঙুলের ডগাগুলি পিষে দেয়, কখনো পা দিয়ে টুনির পায়ের আঙুল মাড়িয়ে দলিত করে। এমনি করে' অনন্ত সমস্ত রাত্রি এই ক্ষতবিক্ষত যন্ত্রণাজর্জর রক্তাক্ত ও নিরাবরণা তরুণীটিকে প্রবল অনাচারের দাপটে জাগিয়ে রেখে সমস্ত ঘরটার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত টানাহেঁচড়া করতে লাগলো।

এক সময় ভোরের আলো এসে পড়লো ঘরের মধ্যে। সেই আলোয় অনন্ত লক্ষ্য করে' দেখলো, টুনির সর্বাঙ্গে তা'রই বর্বরতার অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। সর্বশরীরে কালশিরা, শুক্‌নো রক্ত মাখা মুখখানা বীভৎস নীলাভ, চোখ দুটি অসহ্য যন্ত্রণা ও বেদনায় কোটরগত। অনন্ত স্ত্রীর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে' শিউরে উঠলো।

টুনি সজাগ ও সচেতন হয়ে মহানিদ্রার সমাধির নীচের থেকে যেন হেসে বললে, তুমি ?

অনন্ত বললে, হ্যাঁ আমি !—এই বলে' অনন্ত শাড়ীখানা টেনে নিয়ে স্ত্রীর কোমরে ও গায়ে জড়িয়ে দিল।

টুনি মুখ বিকৃত করলো আড়ষ্ট যন্ত্রণায়। তারপর অনন্তর হাত ধ'রে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, আমার কী হয়েছিল বলো ত? তুমি ফিরে এসেছো!

স্ত্রীর মাথাটি বুকের মধ্যে নিয়ে ধরা গলায় অনন্ত বললে, যদি না এসে থাকি তুমি আমাকে ফিরিয়ে আনো, মিঠু!

বিষধর সর্পের মত অনন্তকে জড়িয়ে ধ'রে টুনি চুপ করে' রইলো।

গুহায় নিহিত

ঘর ওই মাত্র তিনটি। রান্না-ভাঁড়ার অবশ্য আলাদা,—আর দক্ষিণে একফালি বারান্দা,—কিন্তু কল্‌কাতা শহরে এই ফ্ল্যাট্‌টির মাসিক প্রণামী চল্লিশ টাকা।

তিন-চারটি প্রাণীর হাত পা ছড়িয়ে থাকার পক্ষে এমন একটি ফ্ল্যাট্‌ সামান্য কথা নয়! অবশ্য অতিথি-অভ্যাগত এসে পড়বার সম্ভাবনা হ'লে একটু সমস্যা দেখা দেয় বৈ কি।

তা হোক—বসবার ঘরের দেয়ালে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে প্রতিমা বলে, দেবী দিদি একলা আসছেন, কোন ঝঞ্ঝাট তাঁর নেই। বসবার ঘরে থাকলেই বা—?

প্রিয়কুমার বললে, সিঁড়ি দিয়ে লোক যাতায়াত করবে না? তেতলার লোক যাওয়া-আসার সময় তোমার দেবী-দিদির দিকে কেউ যদি উঁকি-ঝুঁকি মারে?

প্রতিমা মুখ ফিরিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। বড়-বড় টানা চোখ, কপালে রেখা নেই, মুখে সংশয়ের চিহ্ন নেই। বলে, সে কি, তাই কেউ করে বুঝি?

করে না?—প্রিয়কুমার বলে, ফ্ল্যাট্‌ওলা বাড়ীতে থাকার কৌতুক তোমার চোখে এখনো পড়েনি। সাধে কি আর বলি, গেঁয়ো ভূতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে!

আচ্ছা—আচ্ছা, আমি না হয় গেঁয়ো ভূত, আর তুমি কল্‌কাতার ছেলে, হয়েছে ত? এখন তা হ'লে কি করবে তাই বলো!—প্রতিমা

দোবার ছবি টাঙানোর পেরেক ঠুকতে থাকে। অতিথি এসে পৌঁছবার আগে ঘরখানা সাজিয়ে তুলতে না পারলে আর চলছে না।

প্রিয়কুমার বলে, ভীষণ সমস্যা! কি করা যায় বলো দেখি এখন?—এই বলে সে মুখ টিপে হাসে।

স্বামীর মুখ-চাওয়া-স্ত্রী নিজের কল্পনায় কোনো প্রতিবিধান করতে না পেরে শেষকালে বলে, বলো না, কি করব?

ওরে বোকা,, এই ত্যাখো—ব'লে প্রিয়কুমার স্ত্রীর কাছে স'রে গিয়ে বলে, এই যে সিঁড়ির ধারের জানলাটা, এটায় পর্দা একটা ঝুলিয়ে দিয়ো, আর এই দরজাতেও একটা—বুঝলে? সেই যে আমি ফুলকাটা রঙীন খদ্দরের থান এনেছিলুম—?

এক মুখ হেসে প্রতিমা এইবার স্বামীর দিকে তাকায়। এত সহজে সমস্যার যে সমাধান হয় আগে কে জানতো! বলে, ঠিক বলেছ, আমার মনেই ছিল না। কিন্তু আমি যে সেলাই জানি নে? কে করবে? কী চমৎকার ফুলকাটা পর্দা করেছে ও-বাড়ীর হররমা! আমাকে যদি কেউ শিখিয়ে দিত!

প্রিয়কুমার বলে, তুমি একটি আস্ত শিমূল ফুল! কত লোকের বউ কত রকম জানে! তুমি কী জানো? জানো কেবল—

মুখের কথাটা প্রিয়কুমারের মুখেই থেকে যায়। দু' জনেই হাসিমুখে তাকায় দুজনের দিকে। চারটি চোখের মধ্যে দুইটিতে চতুর বুদ্ধির দীপ্তি, আর দুইটি চাহনিতে নদীয়া জেলার কোন্ এক অখ্যাত গ্রামের একটি প্রাচীন সরোবরের স্নিগ্ধ ছায়া। প্রতিমা হাসিমুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে পিঠের দিককার আঁচলটা কাঁধের উপর টেনে নেয়।

—আরে, সরো সরো, পেরেক পুঁতে পুঁতে ঘরখানাকে ভরিয়ে তুললে। কী হবে অত ছবি টাঙিয়ে? দেওয়ালে আর মশা-মাছি বসবার

জায়গা নেই! তোমার দেবীদিদি এমন কী মহারাণী ভিক্টোরিয়া আসছেন যার জন্যে এত সাজসজ্জা?

তুমি চুপ করো—প্রতিমা গ্রীবা দুলিয়ে বলে, ওরা কত লেখাপড়া জানা মেয়ে, কত ইংরিজি বই পড়ে! ঘরের চেহারা দেখলে কি মনে করবে বলো ত?

প্রিয়কুমার বলে, ওঃ অমন ঢের-ঢের গ্রাজুয়েট মেয়ে কলকাতায় গড়াগড়ি যায়! তোমার মতন লক্ষীর ঘরে তাঁর মতন থুবড়ি মেয়ে জায়গা পাবেন, এটা তাঁর ভাগ্যি।

তা বৈ কি। এসে দেখবে ঘর দোর আগোছালো; বলবে, অশিক্ষিত মেয়ে আমি! কী মনে করবে বলো ত?

ইঃ—কি মনে করবেন, শুনি? লেখাপড়াতে তুমিই কোন্ কম? তুমিও ত ছোটবেলায় পড়েছিলে শিশুশিক্ষা?

স্বামীর গম্ভীর রসিকতা প্রতিমা বুঝতে পারে না। মুখ ফিরিয়ে বলে, কিন্তু তুমি যে বলো শিশুশিক্ষা পড়লেও মানুষ মুখ্যু থাকে? দেবীদিদি যে ইংরিজিও জানেন।

প্রিয়কুমার বলে, ছোঃ, ইংরিজি! ইংরিজির শিশুশিক্ষাই লোকে পড়ে, তা জানো? তোমার দেবীদিদি যদি বিদ্বান্ হন্ তবে তুমি আর তিনি একই—নাও, হয়েছে, টুল থেকে এবার নামো। ওই ত, বেশ ছবি মানিয়েছে! তোমার দেবীদিদি এমন ঘরে ঢুকলে আর বেরোতেই চাইবেন না দেখো।

স্বামীর কথায় প্রতিমার মন খুশী হয়ে যায়। বলে, থাকলে ত ভালোই, কতদিন দেখিনি। ও-বছরে একবারটি এসেছিল, সেই যে তুমি গাড়ীতে তুলে দিয়ে এলে? সেই যে গো ফটো তুললাম আমরা, মনে নেই? বড্ড ভুলে যাও তুমি, বাপু! সেই যে তোমাকে তিনি একটা পশমের গেঞ্জি বুনে দিয়ে গেলেন?

প্রিয়কুমার বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ছে। তোমার দেবীদিদি দেখতে ঠিক কেমন, বলো ত? মানে, ঠিক মনে পড়ছে না আমার। আমাদের বনমালীর মতন গায়ের রংটা হবে বোধ হয়, না?

ওমা—প্রতিমা চোখ কপালে তুলে শিউরে ওঠে,—তোমার তাহলে একটুও মনে নেই! একেবারে ধবধবে রং, নাক-চোখ কি স্থন্দোর, কেমন গড়ন-পেটন, কেমন চুল—

প্রিয়কুমার একমনে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তাইত। তা বয়স হোলো বৈ কি, যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি,—না কি বলো?

অ্যাঁ?

অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ?

সহসা একঘর হেসে উঠে প্রতিমা তাড়াতাড়ি মুখে আঁচল চাপা দেয়, এবং তেমনিভাবে হাসতে হাসতে স্বামীর গায়ের উপর গড়িয়ে প'ড়ে বলে, পঁয়তাল্লিশ! তাঁর যে এখনো পঁচিশ হয়নি গো।

ও একই।—প্রিয়কুমার বলে, দাঁড়াও, দরজাটা ভেজিয়ে দেই, তারপর দুজনেই হাসবো খুব ক'রে।

চট ক'রে প্রতিমা সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। রুষ্টকণ্ঠে বলে, না, থাক্ দরজা খোলা, তোমার চালাকি আমি জানি। এই সকাল বেলায় তোমার —ছিঃ কী হচ্ছে?

বাইরে খুড়িমার গলার আওয়াজ পেয়ে দুজনেই সতর্ক হয়ে স'রে দাঁড়ায়। তারপর দরজার কাছে এসে প্রিয়কুমার নিজেই বলে, পিসতুতো বোনের ননদ, তার জন্যে আবার এত! আমি বাপু তোমাদের অতিথি-সৎকারের মধ্যে নেই, আমার অনেক কাজ। বসবার ঘরটা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু বন্ধুবান্ধব এলে বসাবো কোথায়?

গুহায় নিহিত

মাথায় ঘোমটা টেনে চাপা গলায় প্রতিমা বলে, একটু কষ্ট করো, লক্ষ্মীটি—

ক'দিন তিনি থাকবেন শুনি ?

তিন দিন গো—

আমাকে দিয়ে যেন ফাই-ফরমাস খাটিয়ো না। মেয়েছেলের ফরমাস খাটাও ঝকমারি।

খুড়িমা বারান্দার ধার থেকে এগিয়ে এসে বলেন, তা আসছে, ভালোই ত ? কবে আসবে গা, বৌমা ?

প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুড়িমার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, আজই বিকেলে।

আয়োজনের আর কোনো ত্রুটি রইলো না। অতিথির কাছে স্বামীর পরিচয় আর ঐশ্বর্যকে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরার জন্য সারাদিন প্রতিমার পরিশ্রমের আর অন্ত নেই। বনমালীর সাহায্যে সমস্ত ফ্ল্যাট্‌টা জল দিয়ে ধুয়ে-মুছে সে তক্‌তকে ক'রে তুললো। শোবার ঘর তিনখানার আসবাব সজ্জাগুলি ঝেড়ে-মুছে চেহারা ফিরিয়ে দিল। দর্জির বাড়ী থেকে দরজা ও জানলার পর্দা তৈরি হয়ে এলো। এদিকে ধবধবে চাদর উঠলো বিছানায়, ঝালর-দেওয়া বালিশ, নেট-এর মশারি,—টেবিলে চীনামাটির ফুলদানি, প্রিয়কুমারের প্রিয় কয়েকখানি বই, টিপাইয়ের উপরে ঘষা-কাঁচের ডুম-বসানো টেব্‌ল্‌-ল্যাম্প,—ওদিকে একটি শেল্‌ফে সুগন্ধি তেল, ভালো সাবান, দাঁতের মাজন, মাথার নতুন ফিতা ও কাঁটা, দেয়ালে ঝোলানো বড় একখানা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, তার পাশে শাড়ী ঝুলিয়ে রাখার একটি আলনা। মহিলা অতিথির অভ্যর্থনা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কোথাও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য নেই। স্বামীর রুচি আর সংশিক্ষার সুখ্যাতি হবে এই আনন্দ-গৌরবে সারাদিন প্রতিমার বুকের ভিতরটা টলমল করতে লাগলো। তা'র মতন স্বামী-ভাগ্য ক'জনের ?

ভালো শাড়ী আর জামা প'রে বেলা চারটে নাগাৎ সবেমাত্র সে পায়ে আলতা প'রে উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময় নীচের দরজায় মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

প্রিয়কুমারের বহু আপত্তি থাকলেও স্ত্রীর অনুরোধে তাকে যেতে হয়েছিল স্টেশনে। মোটরের আওয়াজ শুনে প্রতিমা বারান্দায় হাসিমুখে এসে দাঁড়ালো। খুড়িমা বেরিয়ে এলেন। বনমালী জিনিসপত্র ব'য়ে আনার জন্য নীচে নেমে গেল।

অতিথির মতো অতিথিই বটে। মুখে অপরিসীম গাম্ভীর্য, কিন্তু তবু হাসিমুখ। পরনে দামী শাড়ী, কিন্তু তার চাকচিক্য নেই, যেমন-তেমন ক'রে জড়ানো। হাতে কয়েকটি ফিনফিনে চুড়ির সঙ্গে একটি ছোট সোনার হাত-ঘড়ি, গলায় চিকচিকে হার, পায়ে বাদামী রঙের ফিতা বাঁধা একজোড়া স্লিপার। দীর্ঘ উন্নত দেহ, শঙ্খের মতো সে দেহ মসৃণ, সুন্দর।

প্রতিমার চিবুক নেড়ে আদর ক'রে দেবীরাণী খুড়িমার পায়ের ধুলো নিলো। প্রতিমা বললে, এবারে কিন্তু তিন দিনের বেশী থাকতে হবে তোমাকে, দেবীদিদি।

বক্শিস্?—ব'লে দেবীরাণী হাসিমুখে ফিরে চাইলেন।—বক্শিস্ না পেলে অতিথির চল্‌বে কেন?

প্রতিমার হয়ে প্রিয়কুমার উত্তর দিল, তা বক্শিস্ দেবো বৈকি। আমাদের অকুণ্ঠ সেবা, হৃদয়ের ঐকান্তিক—মানে যাকে বলে—

আপনি কে, মশাই? চিনিনে ত?

খুড়িমা হাসছেন। প্রতিমা মুখে আঁচল চাপা দিল। প্রিয়কুমার বললে, বেশ লোক যা হোক, স্টেশন থেকে আনলুম মাথায় ক'রে, তার জন্যে একটু কৃতজ্ঞতাও নেই। উল্টে বাড়ী বয়ে এসে বাড়ীওয়ালাকে বলেন, আপনি কে মশাই! ঘোর কলিযুগ!

দেবীরাণীর হাত ধ'রে প্রতিমা তা'কে ঘরে নিয়ে এলো। প্রিয়কুমার ভিতরে এসে বললে, বিশিষ্ট অতিথির জন্য আমরা স্বামীস্ত্রী মিলে সারাদিন ঘর সাজিয়েছি। দয়া ক'রে সেদিকে একটু প্রসন্ন দৃষ্টি দেওয়া হোক।

প্রতিমা বললে, ওমা, তুমি আবার কখন কি করলে ?

করিনি ? ফের আবার স্বামীর অবাধ্য হওয়া ?

কখন্ আমি আবার অবাধ্য হলাম গো তোমার ?

হওনি ?—কৃত্রিম রোষ প্রকাশ ক'রে প্রিয়কুমার বললে, অতিথির সামনে আমাকে অপমান ?

প্রতিমা অবাক হয়ে বললে, আচ্ছা দেবীদিদি, এতে অপমান হোলো কোথায় ?

দেবীরাণী তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, মানী লোক কিনা ওরা, তাই ওরা পদে পদে মান খোয়ায় ! তুমি তাই রাগ ক'রো না।

প্রিয়কুমার বললে, আপনার এ কথার মানে ?

মানে এই যে, সারাদিন আমি ট্রেনে এসেছি, এখন বিবাদ বাধালে আপনাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।

প্রতিমা হেসে লুটিয়ে পড়লো।

দেবীরাণী পুনরায় বললে, যান, চা আনুন, ব'সে ব'সে কোঁদল করবেন না। —না, না, তুমি থাকো ভাই, ওঁকে একটু খাটিয়ে নিই। ফাই-ফরমাস করলে উনি বিশেষ দুঃখিত হবেন না।

নিতান্ত অতিথি ব'লেই—এ রকম তাচ্ছিল্য স'য়ে রইলুম।—ব'লে প্রিয়কুমার হাসিমুখে বাইরে চ'লে গেল। খুড়িমা এসে অবশ্য তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, বনমালীর হাতে তিনি চা ও জলখাবার পাঠালেন। মিনিট দুই পরেই প্রিয়কুমার আবার ফিরে এসে বসলো।

দেবীরাণী হাসিমুখে বললে, স্ত্রীকে একটু ভালো-টালো বাসেন? না, কেবল কথার চাতুরীতে গ্রামের মেয়েকে ভুলিয়ে রাখেন?

প্রশ্নটিতে একটু অস্বস্তি আছে বৈ কি। প্রতিমা উঠে পালাবার চেষ্টা করলো। প্রিয়কুমার বললে, পাপ মুখে বলতে নেই। আমাদের ভালোবাসা কি আর অন্য লোকে বুঝবে?

এসেই যে-শাসন দেখলুম তা'তে বিশ্বাস করা একটু কঠিন।—ব'লে দেবীরাণী বক্রদৃষ্টি ফিরিয়ে হাসলো।

প্রিয়কুমার বললে, মেয়েমানুষের দৃষ্টি বেশি দূর পৌঁছয় না।

দেবীরাণী বললে, তাই নাকি? কথাটা শুনলেও মন ঠাণ্ডা হয়। কই, আমার দিকে মুখ তুলে কথা বলুন ত?

প্রিয়কুমার কিন্তু মাথা তুললো না। মুখ নামিয়েই তামাসা করে বললে, স্ত্রী ছাড়া আর কোনো মেয়ের দিকে আমি মুখ ফেরাইনে। এইটি আমার তপস্যা।

দেবীরাণী খুশীমুখে বললে, ওরে বাবা, এত? খুব যে তোষামোদ করতে শিখেছেন? গত বছরের চেয়ে একটু উন্নতি হয়েছে দেখছি। চক্ষু সার্থক হোলো।

বেশ ত, থাকুন না কিছুদিন, আরো দেখতে পাবেন।

রক্ষে করুন, আমার বাজার-হাট করা হয়ে গেলেই এখান থেকে পালাবো।

কোথা পালাবেন?—প্রিয়কুমার মুখ তুললো।

কেন, লক্ষ্ণৌতে? যেখানে চাকরি করি?

প্রতিমা বললে, চাকরি করেই তুমি চিরদিন কাটাবে, দেবীদিদি?

কি আর করি ভাই, বলো?

বিয়ে করবে না বুঝি?

দেবীরাণী শিউরে উঠে বললে, সর্বনাশ, বিয়ে? একটা পুরুষ মানুষ চিরকাল জ্বালাবে, আর তাই সহ্য করব?

ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠলো।

প্রতিমা বললে, তুমি বড়লোকের মেয়ে, চাকরি করে তোমার কী হবে? বিয়ে করেই বা কি স্বর্গলাভ?

প্রিয়কুমার সেখান থেকে হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেল। প্রতিমা সবল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দেবীরাণীর প্রতি। স্ত্রীলোকের বিবাহের দিকে মন নেই! বিয়ে না হলে তাদের স্বর্গলাভ হয় না, তারা স্বামী ছাড়া আর কোনো পরিচয়ে নাকি সংসারে বেঁচে থাকতে পারে, এসব কথা তার কল্পনায় নেই! সুতরাং সর্বপ্রথম যে-কথাটা তার মনে এলো সেইটিই সে প্রকাশ করলো। আসলে, কিন্তু স্বামী ছাড়া মেয়েমানুষকে দেখবে কে, দেবীদিদি?

এতদিন কে দেখলো রে?—ব'লে দেবীরাণী একঝলক মলিন হাসি হাসলো।

প্রতিমা বললে, কিন্তু যখন বয়স হবে? বুড়ো হবে?

বেশ ত, তোরাই ত আছিস। ব'লে দেবীরাণী খুব হেসে উঠলো। কথাটা ওঘর থেকে প্রিয়কুমার কান পেতে শুনলো। তা'র মনের একূল থেকে ওকূল অবধি একটা তরঙ্গ আলোড়িত হয়ে উঠলো।

দেবীরাণীর কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়—সেটা অনেকটা যেন অস্বাভাবিক। তিনখানা ঘর জুড়ে যখন-তখন তা'র অহেতুক পদচারণা লক্ষ্য ক'রে প্রতিমা তা'কে কি যেন একটা প্রশ্ন ক'রে বসেছিল, কিন্তু একটুখানি হাসি ছাড়া আর কোনো বিশেষ সদুত্তর পায়নি। ভাঁড়ার ঘরখানায় ঢুকে প্রত্যেকটি সামগ্রী লক্ষ্য করা, অনাবশ্যকভাবে রান্নাঘরের ভিতরটা পর্যবেক্ষণ ক'রে একটা অকারণ মন্তব্য করা, গৃহসজ্জার খুঁটিনাটি

আলোচনা করে নিজের মতামতটা জানানো, হঠাৎ বাথরুমটায় ঢুকে নিঃশব্দে কতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—এই রকম বিভিন্ন প্রকার খেয়াল লক্ষ্য ক'রে প্রতিমা অনেক সময়ে হেসেই অস্থির। এক সময়ে আড়ালে গিয়ে স্বামীকে সে প্রশ্ন করে, হ্যাগো, দেবীদিদির মনটা এমন উড়ু-উড়ু কেন, বলো ত?

প্রিয়কুমার বলে, তোমার দেবীদিদিকে জিজ্ঞেস করলেই পারো!

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা প্রতিমার আর হয়ে উঠে না। লেখাপড়া জানা মেয়ে ওরা, ওদের মনের ভাব জানতে গিয়ে কি সে শেষকালে নির্বুদ্ধির পরিচয় দেবে?

খুড়িমা এক সময়ে দেবীদিদিকে ধরলেন। বললেন, হাঁ গা, রাণু? তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলুম, মা।

দেবীরাণী খুশী হ'য়ে বললে, কি বলুন?

তোমাকে বাজার হাট করতে কলকাতায় আসতে হোলো? লক্ষ্ণৌ শহরে কিছু পাওয়া যায় না বুঝি?

দেবীরাণী বললে, সবাই কি সেখানে সব পায়, খুড়িমা? তাই ত এতদূরে ছুটে এলুম।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বৈ কি—খুড়িমা চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু তাঁর সন্দিগ্ধ প্রশ্ন আর অব্যক্ত মনোভাবটি লক্ষ্য ক'রে দেবীরাণী যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। একটু পরে খুড়িমা আবার কথা পাড়লেন। বললেন, বিয়ের পরে আমরা জানলুম, তোমাদের সঙ্গে বৌমাদের আত্মীয়তা আছে! কিন্তু তুমি নাকি আগে কলেজে পড়তে প্রিয়কুমারের সঙ্গে?

দেবীরাণী একটু চমকে উঠলো। কিন্তু ভাবগোপন ক'রে বললে, সেটা আমার ঠিক মনে পড়ে না। তবে বছর মিলিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, প্রিয়কুমারবাবু পড়তেন সেই সময়টায়।

তোমার মনে নেই ?

একটু আধটু অস্পষ্ট মনে পড়ে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী ছিল কিনা—

খুড়িমা তাঁর মন্তব্য জানালেন। বললেন, আমি ঠিক ভালো বুঝিনে মা—ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়া, অনেক রকম কথা ওঠে কিনা—

দেবীরাণী বললে, তা ঠিক বলেছেন আপনি। অনেকের জীবন ভেঙেচুরেও তচনচ হয়ে যায় শুনেছি!—এই ব'লে সেখান থেকে সে সরে গেল। প্রতিমা তা'র পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। সরল, নির্বোধ ও গ্রাম্য তা'র দুটি চোখ।

সমস্ত ফ্ল্যাটটার মধ্যে মানুষের মনোবিকলনের একটা সূক্ষ্ম নাটকীয় ঘাত-সংঘাত চলছে, উপরে সেটা প্রত্যক্ষ নয়। ঘটনায় তা'র কোনো প্রকাশ নেই, বাঙ্ময়তায় সেটা আন্দোলিত হয়—কিন্তু চলাফেরায়, চাহনিতে, ভ্রূকুঞ্চনে, ঈষৎ হাস্যে—সেটা প্রকট। প্রতিমার সাধ্য নেই সেটাকে স্পর্শ করে, খুড়িমার সাধ্য নেই সেটাকে আবিষ্কার করেন। এ নাটক সকলের জন্য নয়।

দেবীরাণী এসে দাঁড়ালো এ ঘরে। প্রিয়কুমার তখন একখানা বই মুখে দিয়ে ব'সে রয়েছে। মুখ না তুলেই সে বললে, তোমার দেবীদিদির কোনো অযত্ন হয় না যেন, দেখো।

তুমি নয়, আপনি! দেবীরাণী পিছন থেকে হেসে উঠলো।

সলজ্জ বিস্ময়ে প্রিয়কুমার বললে, বুঝতে পারিনি আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন।

দেবীরাণী বললে, কিন্তু যত্ন করলেও যদি আমি খুশী না হই ?

তাহলে বলুন কিসে আপনি খুশী হবেন ?

যদি বলি, হে বলিরাজা, তুমি স্বর্গ আর মর্ত্যের অধীশ্বর—মস্ত বড় দাতা তুমি। কিন্তু স্বর্গ আর মর্ত্যলোক আমাকে দান করুন—পারবেন ?

প্রিয়কুমার বললে, আপনি অন্তর্যামী নারায়ণ হ'লে পাতালে যে পারতুম বৈ কি।

দেবীরাণী বললে, না, পারতেন না। কোনো যুগেই পুরুষ মেয়ে জন্যে সর্বস্বান্ত হয়নি। মেয়েদের প্রাণ নিয়ে তা'রা জীবন-মরণ খেল খেলেছে। হেরেছে, কিংবা জিতেছে, এইমাত্র। —শেষের কথাটায় তা' গলা একটু ধ'রে এলো।

প্রিয়কুমার নতমুখে চুপ ক'রে রইলো, আর কোনো জবা দিল না।

দেবীরাণী বললে, আপনার খুড়িমার প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত তিনি বলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে এতদূরে এসে বাজার-হাট করা? সেখানে কি কিছুই পাওয়া যায় না?

প্রিয়কুমার বললে, আপনি কি জবাব দিলেন?

ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে দেবীরাণী বললে, সেকথা শুনবার কি কোনো দরকা আছে আপনার? আপনি কি মনে করেন, আপনার খুড়িমার কা কথার চাতুরী খেলতেই আপনার এখানে এসেছি?

এই ব'লে সে স'রে গেল। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো প্রিয়কুমার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইলো। ঘরের বাতাসটা যেন থমথম করছে। কে যেন একটা মস্ত কান্নার গলা টিপে ধরেছে।

এমন সময় প্রতিমা এসে দাঁড়ালো দেবীরাণীর কাছে। মুখ ফিরিয়ে দেবীরাণী বললে, এসেছিস? অতিথিকে কোথাও যেন একলা ফেলে রাখিসনে, তা'কে ভূতে পায়, জানিস ত?

প্রতিমা খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। দেবীরাণী সস্নেহে তা'র গলা ধ'রে বললে, হ্যাঁ রে ভাই, সত্যি! আচ্ছা প্রতিমা, একটা কথা ঠিক ক'রে বলতে পারিস?

কি বলো ত ?

মরুভূমির ওপর যদি বুকের রক্ত গড়িয়ে পড়ে, তবে কি সে-মরুভূমি উর্বর হয় ?

কথাটা যাকে উদ্দেশ ক'রে বলা, সে তখনো বইখানা সামনে ধ'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রয়েছে। প্রতিমা জবাব দিল, আমি ত ভাই বলতে পারিনে !

দেবীরাণী বললে, পারিসনে, কেমন ? বেশ। আচ্ছা, বলতে পারিস, ত্রেতাযুগে কোনো ছলনাময়ী রাজা রামচন্দ্রের মন ভোলাতে চেষ্টা করেছিল ? বোধহয় করেনি, কি বলিস ?

সরলভাবে প্রতিমা বললে, আমি ভাই ছোটদের রামায়ণ পড়েছিলুম, তা'তে এসব ছিলনা।

দেবীরাণী সহসা অন্য জানলাটার কাছে স'রে গেল। তারপর বললে, তোদের এদিকটা বড্ড ফাঁকা। এত ফাঁকায় তোরা থাকিস, মন হু হু করেনা ? কোথাও গাছপালা নেই, কেবল প্রকাণ্ড একটা শূন্য !—তা'র গলাটা যেন শান্ত হয়ে এলো।

প্রিয়কুমার আস্তে আস্তে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেইদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে দেবীরাণী বললে, আমার এক একবার কি মনে হয় জানিস্, প্রতিমা ! মানুষের জীবন হোলো ঈশ্বরের মস্ত একটা জিজ্ঞাসা,—আমরা কেবল তারই উত্তর হাতড়ে-হাতড়ে বেড়াই। সে উত্তর খুঁজে পাবোনা কোনোদিন।

সমস্ত শুনে প্রতিমা বললে, তুমি এবার চান্ করবে চলো, দেবীদিদি।

প্রস্তাবটা শুনে সহসা অহেতুক ব্যস্ততা সহকারে দেবীদিদি ব'লে উঠলো, তাই চল্। খেয়ে দেয়েই আমাকে একবার বেরুতে হবে। কি জানিস ভাই, ঘরের মধ্যে আমার মন কিছুতেই টি`কতে চায়না

অনুযোগের সঙ্গে প্রতিমা বললে, কি ক'রে টি'কবে? ঘরকন্নার স্বাদ যে তুমি পাওনি?

পিছন ফিরে হাসিমুখে দেবীদিদি প্রতিমার গাল দুটি নেড়ে দিয়ে বললে, বোকা মেয়ে! ঘরকন্নার আবার স্বাদ কি রে? প্রাণটাই যদি খুঁজে না পাই, দেহটির দাম কতটুকু?—এই ব'লে সে স্নান করতে চ'লে গেল।

সেদিন কোনোমতে দুটি আহারাদি সেরে দেবীরাণী বেরিয়ে পড়লো। যখন সে ফিরলো তখনও সন্ধ্যা হয়নি। তার পিছনে পিছনে একটি ছোকরা এসে জিনিসপত্র সমেত একটা চাঙারি রেখে চ'লে গেল। দেবীরাণী গিয়েছিল মার্কেটে। চাঙারিতে এক গোছা রজনীগন্ধার সঙ্গে দুটি অন্যান্য ফুলের তোড়া। কতগুলি মরশুমী সুস্বাদু ফল, একখানি অপরাজিতা রংয়ের শাড়ী, এবং নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী। দেবীরাণী নিজের হাতেই সেগুলি ঘরে তুলে নিয়ে এলো।

চাঙারিটি দেখেই প্রতিমা গিয়ে ঘরে লুকিয়েছিল। দেবীরাণী হাসিমুখে ঘরে ঢুকে প্রতিমার হাত ধ'রে টেনে আনলো। প্রতিমা রাগ ক'রে বললে, বছর-বছর এসে তুমি এমনি করে বেহিসেবী খরচ ক'রে যাবে, এবার আমি আর শুনবোনা, দেবীদিদি!

দেবীরাণী বললে, তোকে না সাজালেই আমার চলবেনা রে।

কেন, শুনি?

আচ্ছা শোনাবো একদিন। এই ব'লে দেবীরাণী তা'কে প্রিয়কুমারের পড়ার ঘরে টেনে নিয়ে এলো। পুনরায় বললে, যদি বলি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত তোকে শোনাবো,—তোর ঘুম পাবেনা?

প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, দেবীদিদি?

কেন রে?

তোমার কথা কোনোদিন আমি বুঝতে পারিনি।

তা'হলে নিশ্চয় আমি একটা পাগল! ··ব'লে দেবীরাণী হেসে উঠলো। কিন্তু সে-হাসিতে এবার প্রতিমা যোগ দিতে পারলোনা।

দেবীরাণী প্রতিমার সুন্দর ও সুকুমার দেহখানিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জামা ও কাপড় পরিয়ে দিল। চোখের পাতায় কাজলের মোহ এঁকে দিল, তা'র খোঁপায় দিল ফুল, পায়ে দিল আলতা। তারপর বললে, পারবিনে ভোলাতে?

প্রতিমা হেসে বললে, কা'কে?

দেবীরাণী বললে, স্বামীকে নয়, পুরুষকে।

ওমা, সে কি?

হ্যাঁ রে। স্বামী ত ভুলতে বাধ্য—কিন্তু স্বামীর মধ্যে যে পুরুষের বাসা, তা'কে ভোলানো বড় কঠিন, প্রতিমা। কিছু দিয়েই তা'কে ভোলানো যায় না—মেয়ে মানুষের সমস্ত জীবনের তপস্যাটাও তাদের কাছে কিছু নয়! তারা নির্দয়, হৃদয়হীন,—তা'রা হিমালয়! যদি ভোলাতে পারিস, বুঝবো আমার এই সাজানো সার্থক। এই ব'লে সে গলাটা একবার ঝেড়ে নিল।

প্রতিমা বললে, একথা কেন বল্‌ছ, দেবীদিদি? উনি ত তেমন মানুষ নন্ যে, আমাকে অনাদর করবেন? অনেক পুণ্যের জোরে আমি ওঁকে পেয়েছি!

দেবীরাণী পিছন দিকে দাঁড়িয়ে প্রতিমার আল্‌গা খোঁপাটা ঠিক ক'রে দিচ্ছিল। কিন্তু প্রতিমার কথায় ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো তা'র চোখ দুটো পলকের জন্য জ্বলে উঠলো, সেটা আর দেখা গেল না। কেবল শান্ত কণ্ঠে বললে, নিশ্চয়, সে একশো বার। তোর মতন পুণ্যবতী ক'জন আছে ভাই?

প্রতিমা স্বস্তিবোধ ক'রে নীরব হয়ে গেল। কিন্তু তারপর, সাজসজ্জার শেষে, দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার ঠিক পথেই প্রিয়কুমার এসে হাজির। স্ত্রীর দিকে চেয়ে সে বললে, একি? ইন্দ্রসভায় আজ নাচের ফরমাস আছে নাকি?

প্রতিমা হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল ভাঁড়ারের দিকে। দেবীরাণী পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালো প্রায় প্রিয়কুমারের মুখোমুখি। কৈফিয়ৎ স্বরূপ প্রিয়কুমার বললে, কলেজ থেকে বেরিয়ে আজ যেতে হয়েছিল এক চায়ের পার্টিতে। জানি, অতিথির আজ কিছু অনাদর ঘটে গেছে।

পাথরের পুতুলের মতো দেবীরাণী দরজাটার গায়ের উপর [illegible] নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মৃদুকণ্ঠে ব'লে বসলো, কেবল আজ ত নয়—[illegible]!

কথাটার সঙ্গে একটা চাবুকের আঘাত ছিল, কিন্তু প্রিয়কুমার [illegible]কে ভ্রূক্ষেপ করলো না। একরাশ বই টেব্‌লের ওপর রেখে মুখ ফিরিয়ে সে শুধু বললে, আপনার কি কালই যাওয়া স্থির?

না।

আর কতদিন থাকবেন?

যতদিন খুশী।

প্রিয়কুমারের গলার কাছে আতঙ্কের মতো কি যেন একটা [illegible]লে উঠলো। কিন্তু সেটাকে চেপে হাসিমুখে সে বললে, কিন্তু বাসনার চিহ্ন প্রতিমার সর্বাঙ্গে এঁকে-এঁকেই কি এখানে দিন কাটাবেন!

দেবীরাণী চুপ ক'রে রইলো।

প্রিয়কুমার পুনরায় বললে, পুরুষকে যন্ত্রণা দেবার নির্ভুল পথ এটা নয়!

দেবীরাণী মুখ তুললো। সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা গেল না, তা'র তীব্র চোখ-দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল কি না। সে কেবল অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে বললে, তবে নির্ভুল পথ কোন্‌টা? কেমন ক'রে যন্ত্রণা দিলে

তোমার বুক ভেঙে দেওয়া যায়—ব'লে দিতে পারো?—এই ব'লে সে ছুটে সেখান থেকে চলে গেল। ঝরঝরিয়ে তা'র চোখে জল এসেছিল।

নিজের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে প্রিয়কুমার পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেদিন সে মাথার কাছে টেব্‌ল-ল্যাম্পটা রেখে বিছানায় শুয়ে একখানা মোটা ইংরেজি বই মুখের কাছে নিয়ে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। রাত তখন অনেক। ওঘরে প্রতিমা আর দেবীরাণী নিদ্রিত। তার পাশের ঘরে খুড়িমা। এ ঘরে আলোটা জ্বলছে, দরজাটা খোলাই রয়েছে।

পড়তে পড়তে কখন্ যে তার দুই চোখে ঘুম এসেছে, কখন্ ঘড়ির কাঁটাগুলি ঘুরে ঘুরে শেষ রাত্রির দিকে এসে পৌঁছেচে, প্রিয়কুমারের কিছুমাত্র চেতনা ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার পেরিয়ে জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে, রাতজাগা পাখী কোথায় হায়রান হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কখন্ নিঃসাড় অন্ধকার জগৎ তা'র চক্রপথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে প্রভাতের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল, তাও এই ক্ষুদ্র পরিবারটির অজ্ঞাত ছিল।

সহসা আচমকা এক সময়ে প্রিয়কুমারের ঘুম ভেঙে গেল। কখন্ সে ঘুমিয়েছিল, কেন তা'র ঘুম ভাঙলো, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। কিন্তু উৎকর্ণ অধ্যাপকের বিশ্লেষণী বুদ্ধি একথা অনুভব করলো, তার আচমকা ঘুমভাঙার একটা সঙ্গত কারণ আছে বৈ কি। ঘরের খোলা দরজা, উজ্জ্বল আলো, ব্রাকেটের ওপর টিকটিকে ঘড়ি, দেয়ালের ছবি, কাপড়ের আলনা—সবগুলো যেন চক্রান্ত ক'রে মুখ বুজে গোপন কথাটা চেপে রয়েছে। মনে হচ্ছে একটা অস্পষ্ট সংবাদ তার অচেতন ঘুমের মধ্যে নিঃশব্দসঞ্চারে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটার অশরীরী আত্মাটা এখনো তা'র এই পড়ার ঘরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, ঘড়িতে রাত সাড়ে চারটা বাজে। এতক্ষণ ধ'রে সে ঘুমিয়েছে? এত তা'র ঘুম?

সহসা বাইরে খুড়িমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল,—ওখানে কে গা দাঁড়িয়ে? বৌমা নাকি?

পলকের জন্য মৃত্যুর মতো একটা তুহিন স্তব্ধতা। তারপর শোনা গেল, না খুড়িমা, আমি।

কে, রাণু?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

খুড়িমা বললেন, এত রাত থাকতে উঠেছ কেন, রাণু?

তাঁর কণ্ঠে কেমন একটা সংশয়ের আভাস পেয়ে দেবীরাণী একটু থতিয়ে জবাব দিল, ঘুমটা ভেঙে গেল রাত্ত থাকতেই। আজ ভোরের গাড়ীতে যাবার তাড়া আছে কিনা—

এটা একটা আকস্মিক কৈফিয়ৎ, প্রিয়কুমারের কানে বাজতে লাগলো। দেবীরাণী চ'লে যাওয়া স্থির ক'রে ফেললো একটি নিমেষের মধ্যেই। সে এত অস্থির, এতই অতৃপ্ত!

খুড়িমা বললেন, ওমা, প্রিয়কুমারের ঘরে আলো জ্বলছে কেন? ও কি এখনো ঘুমোয়নি? বৌমা, শুনছ? ও বৌমা—?

প্রতিমা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো। উঠে সাড়া দিল, কেন খুড়িমা?

তোমার এত ঘুম কেন, বৌমা? সমস্ত রাত ধ'রে প্রিয়'র ঘরে আলো জ্বলছে, দরজাটা খোলা—তুমি একটিবার খবর নিতে পারোনি কেন? এত রাতে রাণু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দায়, তা'রও একটা খোঁজখবর রাখা তোমার উচিত ছিল, বৌমা?—খুড়িমা বিরক্ত, উত্তপ্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিমা বাইরে এসে বললে, দেবীদিদি, এখানে দাঁড়িয়ে যে?

দেবীরাণী অসাড় ও চেতনাহীন হয়ে জ্যোৎস্নালোকের দিকে নিমেষ-নিহত চক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতিমার প্রশ্নে সে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি ফিরিয়ে

মৃদুকণ্ঠে বললে, তোমার বাড়ীতে এক জায়গায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা, কিংবা রাতজাগার স্বাধীনতা নেই—একথা জানতুম না, প্রতিমা।

তা'র গলার আওয়াজে প্রতিমা একটু লজ্জিত হয়ে সরে' দাঁড়ালো। বললে, না দিদি, তুমি ঘুমোওনি কিনা তাই বলছি।—আসছি ভাই ওঘর থেকে।

প্রতিমা এলো স্বামীর ঘরে। বিছানার কাছে এসে সে প্রিয়কুমারের পা ঠেলে ডাকলো, কিন্তু একবার ঘুমোলে প্রিয়কুমারের নাকি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে একেবারে বেহুঁস, তা'র নাক ডাকছে। পাছে শেষরাতে জাগালে প্রিয়কুমার বিরক্ত হয়, সেজন্য প্রতিমা আর তা'কে ডাকলো না। কিন্তু নিজের হাতখানা সরিয়ে নিয়ে প্রতিমা দেখলো, তা'র হাতে জলের দাগ। নদীয়ার কোন্ এক ক্ষুদ্র গ্রামের সরল মেয়ে সে, সে নির্বোধ—জলের দাগের কারণটাকে সে তলিয়ে বুঝলো না। আলোটা নিবিয়ে, দরজাটা ভেজিয়ে সে বেরিয়ে এলো। তা'র মনে কোনো সন্দেহের ছোঁয়া লাগেনি।

খুড়িমা বললেন, তুমি আর ঘুমিয়োনা, বৌমা। রাণু যাবে ভোরের গাড়ীতে—তা'র জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে দাও। বনমালীকে ডেকে উনুনে আগুন দিতে বলো।

শরৎকালের রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। প্রিয়কুমার ঘুম থেকে উঠলো। শুনলো দেবীরাণী এখনই চ'লে যাবে। সে মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হোলো। বনমালী গাড়ী ডেকে আনলো।

দেবীরাণী গাড়ীতে ওঠবার আগে প্রতিমাকে আদর করলো, তারপর প্রিয়কুমারের দিকে ফিরে বললে, শুনেছি মরবার পরে মানুষ কোথায় গিয়ে যেন নিজের একটা কৈফিয়ৎ দেয়। আমিও কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে পারবো, সমস্ত জীবন ধ'রে জলে পুড়ে খাক্ হয়েছি বটে, কিন্তু নিরপরাধকে কখনো প্রতারণা করিনি।

প্রিয়কুমার হাসিমুখে বললে, কিন্তু নিরপরাধকে অনিচ্ছায় যারা চিরদিন ধ'রে ঠকাবে, তাদের কি উদ্ধার নেই ?

প্রভাতের আলোর মত দেবীরাণী হেসে উঠলো। বললে, বেশ ত, আপনি আর আমি একসঙ্গে গিয়ে যদি মহাকালের বিচার সভায় দাঁড়াতে পারি, তখন এর মীমাংসা হবে।

অদূরে দাঁড়িয়ে খুড়িমা বললেন, তোমার গাড়ীর সময় হোলো, রাণু। এসো মা, এসো—সুমতি হোক—দুর্গা—দুর্গা—

দেবীরাণী গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ী ছেড়ে দিল। সেইদিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রিয়কুমার মনে মনে বললে, সেখানেও এর মীমাংসা হবে না, রাণু!

মুক্তিস্নান

বিহার ও যুক্তপ্রদেশের প্রায় সন্ধিস্থলে কোন একটি ছোট শহরে য়্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাষ্টার হারাধনবাবু বছরখানেক আগে বদলি হয়ে এসেছেন। তেরো বছর চাকরি করার পর আজও হারাধনবাবু স্টেশন মাস্টারের পদটি অধিকার করতে পারেন নি, সেজন্য তাঁর মনেও যেমন কিছু ক্ষোভ জমা ছিল, তেমনি তাঁর স্ত্রী নিভাননীর সঙ্গেও এই নিয়ে একটা বচসা লেগে থাকতো। সুতরাং একদিকে আত্মসম্মান আর অন্যদিকে পারিবারিক শান্তিরক্ষার জন্যও হারাধনবাবু প্রকাশ্যে এবং গোপনে পদবৃদ্ধির চেষ্টাটা জাগিয়ে রাখতেন।

সেদিন সকালে এই আলোচনাটা নিয়ে নিভাননীর সঙ্গে একটা সরব দৃশ্যের অবতারণা হয়ে যাবার পর তিনি বিরক্ত ও বিরস মুখে যখন বানপ্রস্থের কল্পনায় চুপ ক'রে বসেছিলেন, সেই সময়ে তাঁর দশ বছরের মেয়ে গেনি এসে খবর দিল, একটা লোক ডাকছে তোমাকে।

বিকৃত মুখখানা তুলে হারাধন বললেন, কে?

নাম বললে, উমাপতি।

হারাধনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, যা যাঃ—উমাপতি! কে উমাপতি? চিনিনে—যা। বিনা টিকিটে ধরা পড়েছে, এখন পায়ে ধরতে এসেছে। যা, বল্‌গে—নেই!

গেনি চ'লে গেল। একটু পরে আবার ফিরে এসে বললে, বিনা টিকিটের নয়, বাবা। লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। এক গাদা ছেলে-মেয়ে আর বউ আছে সঙ্গে।

উমাপতি কে, অনেক চেষ্টা ক'রেও হারাধনবাবু চিনতে পারলেন না। কিন্তু এবার একটু ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, বলি, কোথা গেলে? শুনছ? এদিকে এসো একবার।

নিভাননী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো হলুদমাখা হাতে। মুখ খিঁচিয়ে দাঁত চিবিয়ে বললে, বাইরে ডাকছে ত এখানে মেনিমুখো হয়ে বসে আছ কেন, শুনি? দরবারে দাঁড়াবার মুখ নেই?

বাইরে আবার ডাক পড়লো, হারাধনবাবু, আছেন নাকি?

সমগ্র চাকরি জীবনের অবসাদ আর আত্মগ্লানি মুখে মেখে কোমরের কাপড় শক্ত ক'রে জড়িয়ে হারাধন বাইরের দিকে গেলেন। পিছন থেকে তাঁর দেহের গড়নের অসঙ্গতির দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে নিভাননী বললে, পোড়াকপাল আমার!—ব'লে ঝট্‌কা দিয়ে মুখখানা সে ঘুরিয়ে নিল।

বাইরে এসে দাঁড়াতেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক নমস্কার জানিয়ে খুশীমুখে বললেন, আমাকে চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি, গ্রাম সম্পর্কে আপনাকে আমি শালা বলতে পারি। এই আমার চারটি ছেলেপুলে···ওগো, নেমে এসো গাড়ী থেকে।

মোটা-সোটা একটি বউ ঘোমটা দিয়ে নেমে এসে থপ্ ক'রে হারাধনের পায়ের ধুলো নিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলতে হবে বৈকি। কে উমাপতি, কে এই ছেলে-মেয়েরা, কে বা এই স্থূলাঙ্গিনী বউ, তাঁর সঙ্গে এদের গ্রামসম্পর্কই বা কোথায়,—এসমস্ত মনে মনে নিষ্ফল অনুসন্ধান ক'রে নির্বোধ অর্বাচীনের মতো হারাধন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে বেসামাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উমাপতি বললেন, চিনতে পারছেন না, কেমন?

অকূলে কূল পেয়ে হারাধন বললেন, না, মানে ঠিক···হেঁ হেঁ···পারছি, তবে কিনা আমার স্মরণ-শক্তিটে তেমন···চেনা-চেনা বৈকি—

সঙ্গে তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে। ওদের মধ্যে নোলকপরা রোগা মেয়েটি বললে, মাগো, তুমি যে বললে মামার বাড়ী পৌঁছে সরবৎ খেতে দেবে আমায় ?

ছেলেটা তা'কে শাসন ক'রে বললে, এঃ মামার বাড়ীর সরবৎ ! বেগুনি খেলিনে সকাল বেলায় ? উল্লুক কোথাকার !

ওদের মধ্যে বড় মেয়েটা হাঁ হাঁ ক'রে উঠলো, ওমা, মাগো, ওই দেখো আম্মার কাণ্ড। ঘাগরা নোংরা ক'রে ফেলেছে···আর চাপতে পারেনি।— এই উজি, নাক খুঁটছিস কেন অমন ক'রে ?

উজি তা'র বড় বোনের দিকে মুখ বেঁকিয়ে মায়ের পাশে গিয়ে লুকোল।

বউটি এবার ঘোমটার ভিতর থেকে ইঙ্গিতে স্বামীকে স'রে দাঁড়াতে বললে। তারপর ঘোমটা একটু তুলে হাসিমুখে হারাধনের দিকে চেয়ে পুনরায় বললে, আমাকে চিনতে পারছো না হারুদা ?

সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, তার দুধারে চুল ওঠা। চোখের নীচে আর চোয়ালে প্রচুর মাংসলতা, নাকে নাকছাবি, পানের রসের দাগে দুপাটি দাঁত কালো কালো। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি এসেছে বৈকি। হারাধন একবার পলকের জন্য তা'র দিকে তাকিয়ে সংশয়ের দোলায় দুলতে লাগলেন।

চলিত ভাষায় এ অবস্থাটাকে নাটকীয় পরিস্থিতি বলতে পারা যেতো। কিন্তু এই বিসদৃশ নাট্য মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। বউটি তখনই স্বামীকে শুনিয়ে বললে, একেবারে বদ্‌লে গেছ, হারুদা ? আমি যে সুলক্ষণা।

হারাধনের চোখ দুটো ঈষৎ যেন চকচকে হ'য়ে উঠলো। উমাপতি কাছে এসে দাঁড়ালেন। সুলক্ষণা বললে, বড়-মুখ ক'রে তোমাদের নিয়ে এলুম ওঁর বাড়ীতে, আর উনি চিনতে পারবেন না ? কুড়ি বাইশ বছর

আগে আমাদের চোরবাগানের বাড়ীতে হারুদারা ভাড়া ছিলেন, কত ঘনিষ্ঠতা আমাদের দুই পরিবারে ছিল! তা পাঁচ ছ'মাস তোমরা ঘরভাড়া নিয়েছিলে, কেমন হারুদা?

হারাধন বললেন, হাঁ, তা হবে বৈকি—

সুলক্ষণা বললে, বড্ড রোদ্দুর এখানে···ছেলেমেয়ে ক'টা চিম্‌সে গেল। চলো, তোমাদের বাসা কেমন দেখি। বউ কোথায়? তোমাদের ছেলে মেয়ে কি? বলতে বলতে সে ভিতর দিকে অগ্রসর হোলো।

গাভীর সঙ্গে বাছুর যেমন দাম্‌ড়া হয়ে ছোটে, তেমনি সুলক্ষণার চারিটি ছেলেমেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে হারাধনের ছোট বাসাবাড়ীটি আক্রমণ করলো।

নিভাননী দেখেশুনে একেবারে অবাক। কিন্তু পাছে সে আগেভাগে ঝঙ্কার দিয়ে কোনো অবাঞ্ছনীয় মন্তব্য ক'রে বসে, সেজন্য বেচারা হারাধন উমাপতির সঙ্গে লৌকিকতা স্থগিত রেখে হন্তদন্ত হয়ে ভিতর মহলে গিয়ে মেয়েদের মাঝখানে দাঁড়ালো। দেখা গেল, দুটি পরস্পর অপরিচিতা স্ত্রীলোক একজন অপরের মুখের দিকে চেয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। গৃহ-বিড়াল যেন বনবিড়ালকে আবিষ্কার করেছে অকস্মাৎ। হারাধন অস্থির ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, ওগো, একে তুমি আগে দেখোনি, ইনি তোমার সম্পর্কে একটি ননদ, নাম সুলক্ষণা। অনেক কাল আগে এদের বাড়াতে আমরা ঘড়ভাড়া নিয়ে ছিলুম কিনা—সেই থেকেই খুব আলাপ!

নিভাননী বললে, তা বেশ ত, থাকা হবে বুঝি?

সুলক্ষণা বললে, হ্যাঁ বৌ, আমরা তোমার অতিথি!—একটু মিছরি ভিজিয়ে দাও ত ভাই।

নিভাননী পুনরায় রান্নাঘরে চ'লে গেল। যাবার আগে বললে, তা ভাই আমাদের মাত্তর দুটি ঘর! বেশী মানুষ কুলোয় না!

সুলক্ষণার কানে বোধ হয় সেসব কথা উঠলো না। এখান থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, বৌ, অ বৌ, চিঁড়ে মুড়কি যা তোমার ঘরে আছে বার করো ভাই—ক্ষুদে রাক্কুসীরা আমায় খেলে। পশ্চিমে এসে ছুঁড়িদের ক্ষিদে বেড়েছে কী! চা আছে ত ভাই? উনি কাল রাত থেকে কিছু খাননি, ওঁকে চা আর জলখাবার পাঠিয়ে দাও, বৌ।

স্ত্রীর মন্তব্যটি শোনবার আগেই হারাধন সেখান থেকে গা ঢাকা দিলেন।

এদিকে এসে হারাধন দেখলেন, খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। বাসাটার সামনে ছিল একটা বেড়া-দেওয়া শাকসব্জির উঠোন। নীলু নামক বালকটি সেখানে ঢুকে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে পড়েছে। মাচা থেকে ছোট গোটা দুই কাঁচা কুমড়ো পেড়ে দুটো মেয়েতে মিলে সেগুলো নিয়ে গড়াগড়ি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। গেনি বাধা দিতে গিয়েছিল, সে বেদম মার খেয়ে চেঁচামেচি আরম্ভ করেছে। ভেডি নামক মেয়েটা কাদাপায়ে ঘরের বিছানার ওপর উঠে টাইম-পিস ঘড়িটা নিয়ে তার যন্ত্রবিজ্ঞান পরীক্ষা করতে সুরু করেছে।

হারাধন দৌড়ে গিয়ে সেটা তা'র হাত থেকে নিয়ে বললেন, ছি মা, এটায় হাত দিতে নেই, ভেঙে যাবে।

নীলু এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা কাঁচের জার পেড়ে নিল। তা'তে ছিল ক্ষীরের প্যাঁড়া। নীলু সেটা খুলে খেতে বসলো দেখে গেনি আবার চীৎকার ক'রে উঠলো, ও মা, মা গো, কী সর্বনাশ করছে ত্যাখো ছেলেটা···সব প্যাঁড়া খেয়ে ফেললে···রাক্ষস কোথাকার!

উমাপতিবাবু সন্তানদলের এই বাল্যলীলা মুগ্ধনয়নে দেখছিলেন। এবার বললেন, ছেলেমানুষ কিনা—

ঘটনাস্থলে স্ত্রীর আবির্ভাবের আশঙ্কায় হারাধন বাবু বিবর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। ঢোক গিলে কেবল বললেন, হাঁ্যা, ভারি ছেলেমানুষ!

কিন্তু স্ত্রীর বদলে এলো সুলক্ষণা। কলাইয়ের বাটিতে এক[illegible] চা আর একটি পাত্রে খান আষ্টেক লুচি এনে উমাপতির কাছে [illegible] বললে নাও, জল খেয়ে নাও। ভাতের কিন্তু একটু দেরী হবে, এর [illegible] যেন তুমি আর খাই-খাই ক'রো না।

লুচি দেখেই হারাধনের গলাটা কাঠ হয়ে এলো। এবং কি [illegible]কার মনোবৃত্তি নিয়ে নিভাননী এই লুচির গোছা তৈরী ক'রে দিয়েছে, অথবা এর পরে তাঁর বরাতে কিরূপ লাঞ্ছনা আপাতত মুলতুবী রইলো, এই কথাটা মনে ক'রে হারাধন স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তখনই ভীমরুলের দলের মতো চারিদিক থেকে ছেলেমেয়েরা ছুটে এলো, এবং অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই বাপের জলখাবারের থালা থেকে লুচির ভাগ ছিনিয়ে নিয়ে খেতে আরম্ভ ক'রে দিল। সুলক্ষণা গোটা দুই মেয়েকে আর নীলুকে দুড়দাড় ক'রে ঠেঙালো, তা'রা হাউমাউ করলো, কিন্তু খাওয়াটা ছাড়লো না।

হারাধন বললেন, আগে ছেলেপুলেদের খেতে দিলেই পারো, সুলক্ষণা?

সুলক্ষণা একগাল হেসে বললে, তোমার বউ একটু কেপ্পন, হারুদা। আমাকে বললে, ঘি বেশী নেই; কিন্তু আমি চোরবাগানের মেয়ে, গলা বাড়িয়ে ভাঁড়ার ঘরে ওৎ পেতে দেখলুম, ছোট টিনের এক টিন ঘি।

তাই নাকি?—উমাপতি পরম তৃপ্তির সঙ্গে দুখানা লুচি একসঙ্গে মুখে তুললেন।

হারাধন সহাস্যে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, সুলক্ষণা তাঁকে ডেকে বললে, আমিও প্রথমটা তোমাকে চিনতে পারিনি, হারুদা। তোমার এতবড়

ভুঁড়ি হোলো কবে? মুখের ভাব বদলেছে, গড়ন বদলেছে—একেবারে বুড়ো হয়ে গেছ তুমি।

বয়েস হয়েছে যে!—হারাধন বললেন।

সুলক্ষণা বললে, আহা, কী বা বয়েস! বড়জোর চল্লিশ পেরিয়েছে, এই ত? উনি যে পঞ্চাশে পড়লেন গেল ভাদ্দরে!

উমাপতিবাবু হাসিমুখে বললেন, একটু বেশী বয়সে বিয়ে করে ফেলেছি কিনা। আমার কোলের মেয়েটা প্রায় নাতনীর বয়সী!

সুলক্ষণা বললে, অনেকদিন ধ'রে তোমাদের খোঁজ করছিলুম, হারুদা। মাসতিনেক আগে লাটুমিত্তিররা বললে, তুমি এখানে আছ। আমরা গিয়েছিলুম কাশীতে, ভাবলুম, একবার তোমাকে দেখেই যাই না? সংসারী হয়েছ, বিয়ে করেছ—খুব দেখতে সাধ হোলো!

হারাধন বললেন, কাশী গিয়েছিলে বেড়াতে বুঝি?

না, হারুদা!—সুলক্ষণা বললে, ওঁর জন্যে অনেকদিন থেকে মান্‌সিক ছিল বাবা বিশ্বনাথের কাছে, তাই বালা দু'গাছা বিক্রি ক'রে ওঁকে নিয়ে কাশী গিয়েছিলুম! অনেক খরচ হয়ে গেছে, হাতে আর কিছু নেই!

হারাধন আড়ষ্টভাবে বললেন, অসুখ-বিসুখে মান্‌সিক ছিল নাকি?

স্বামী-স্ত্রীতে একবার দৃষ্টি বিনিময় হোলো। সুলক্ষণা বললেন, একটু এদিকে এসো, বলি।

হারাধন তা'র সঙ্গে বাইরে এলেন। বোধহয় আসল কথাটাকে একটু হাল্‌কা করার জন্য সুলক্ষণা বললে, এদিকটা তোমাদের বেশ নিরিবিলি, গাছপালাও আছে দেখছি। বাড়ীভাড়া দিতে হয় নাকি?

হারাধন বললেন, না, এটা রেলের কোয়ার্টার কিনা—

সুলক্ষণা বললে, কতকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা। অল্পদিনের আলাপ, তবু ছোটবেলার কত ঘনিষ্ঠতা। আমাকে ভুলে গিয়েছিলে ত?

হাসিমুখে হারাধন বললেন, পঁচিশ বছর পরে বাপ এসে দাঁড়ালেও চিনতে দেরী লাগে সুলক্ষণা!

কয়েক মুহূর্ত সুলক্ষণা চুপ ক'রে রইলো তারপর বললে, একটা কথা তোমাকে বলছিলুম, হারুদা। আজ দু'বছর ওঁর চাকরী নেই কিনা, তাই ভারি কষ্টে পড়েছি। তুমি আমাদের একটা উপায় ক'রে দাও।

কি করতে পারি বলো?

এই ধরো রেলে একটা কোথাও কিছু? মান্‌সিক করতে কাশী গেলুম, ওঁর যদি কোথাও একটা কিছু হয়। টিকিট বিক্রির কাজ-টাজ যদি কিছু একটা জোটে তাই বলছিলুম। উনি আবার বড় লাজুক, মুখ ফুটে বলতে পারেন না কিছু।

হারাধন বললেন, এখন নির্দিষ্ট কিছু বলা কঠিন। তবে চেষ্টা করা যেতে পারে। অবিশ্যি উমাপতিবাবুর একটু বয়স বেশী হয়ে গেছে কিনা—

সুলক্ষণা বললে, এমন আর কী বয়েস, সবে পঞ্চাশ। দরখাস্ত লেখার সময় পঁয়তাল্লিশ বললেই চলবে। তোমাকে ব'লে রাখলুম, ভেতরে ভেতরে উনি এখনো ডাঁটো আছেন! মানুষটা তোমাদের আশীর্বাদে ভালোই।

স্থূলাঙ্গিনী মাংসল সুলক্ষণা দুই পাটি দাঁতে তৃপ্তির হাসি হাসলো।

এমন সময় ওধার থেকে গেনি আবার গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, ওগো, মাগো, আমাদের লেপখানা কী নোংরা করলে ছাখো।

ভেড়ি নামক মেয়েটা বিছানা থেকে লেপখানা টেনে নিয়ে বাইরে গিয়ে শ্লোক ধরেছে, 'মামার বাড়ী ভারী মজা কীল চড় নাই!'

সুলক্ষণা তা'র আনন্দ দেখে একেবারে হেসেই অস্থির। বললে, ছাখো হারুদা, ছাখো মেয়েটা কী দুষ্টু।—দেয়ালে ওখানা কি গো? মেয়েছেলের ছবি দেখছি।

হঠাৎ হারাধনের চোখ পড়লো সেদিকে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে তিনি বললেন, কা'র ছবি ব'লে মনে হয়?

সুলক্ষণা দেয়ালের কাছে গিয়ে স'রে দাঁড়ালো। ছবিখানার দিকে নিরীক্ষণ ক'রে বললে, রং চ'টে জ'লে গেছে ছবিখানার। অনেককালের ছবি দেখছি। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কা'র ফটো, হারুদা?

হারাধন বললেন, তোমারই ফটো! সেই যে বাড়ী ছেড়ে আসার সময় তুমি আমার হাতে দিয়েছিলে?

সুলক্ষণা ছবিখানার দিকেই চেয়ে রইলো, মুখ ফেরালো না। বললে, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি এবার। আমাদের বাবুকাকার ক্যামেরা ছিল, তিনিই আমার ফটো তুলেছিলেন। বোধ হয় বছর পনেরো তখন আমার বয়েস।

ক্ষণকালের জন্য এই নরনারী দুটি হয়ত আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকবে। হারাধন বললেন, সুলক্ষণা, তোমার মনে আছে, বাড়ী ছেড়ে আসবার সময় তোমরা আর আমরা কত কাঁদতে লাগলুম। সেই চোরবাগানের গলিতে খেলা, সেই চিলকোঠার ছাদে গিয়ে গল্পগুজব, সেই বেলগাছে বেম্মদত্যি…

সুলক্ষণা ছবিখানার দিকেই তাকিয়ে ছিল। রং-চটা ঝাপসা ছবি হলেও দেখা যায়, একটি সুশ্রী ও সুকুমার কিশোরীর ছবি। চোখ দুটিতে ভাবীজীবনের মধুর স্বপ্নাভাস, চিবুকে একটি ললিত হাসির রেখা, পেলব দুখানি বাহু, আলুলায়িত চুলের রাশি। এই ফটোর সঙ্গে আজ সুলক্ষণার কোনো সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি নেই।

অপলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে সুলক্ষণা বললে, এতকাল পরেও ছবিখানা তুমি রেখেছ? নষ্ট হয়নি?

হারাধন হাসিমুখে বললেন, অনেকগুলো ছবির সঙ্গে ওখানাও মিলে থাকে। যেখানেই যাই, আপনা হ'তে ছবিগুলো দেয়ালে গিয়ে ওঠে।

বউ জানেনা ?—সুলক্ষণা দেয়ালের দিকে চেয়েই প্রশ্ন করলো।

হারাধন বললেন, না। কোনোদিন উনি জিজ্ঞেসও করেননি, ওঁকে জানাবারও দরকার হয়নি। ওখানা অমনিই থাকে। সত্যি বলতে কি, ওখানার কথা আমিও ভুলে গিয়েছিলুম, সুলক্ষণা। আজ চোখে পড়লো যেন কতকাল পরে। আচ্ছা, তোমরা জিনিসপত্র ঠিকঠাক করো, আমি একটু ওদিকে দেখি।—ব'লে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

বাসাটার বাইরে স্টেশনের সামনেই ধূলিধূসর মাঠ। সেই মাঠের উপর দিয়ে হেমন্তকালের নীল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশটা ইস্পাতের ফলার মতো ঝিকমিক করছে। দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অদূরবর্তী রেল-লাইনের দিকে সুলক্ষণা তাকালো। রেলপথটা যেন অতীতের কোনো বিস্মৃতিলোক থেকে বেরিয়ে এসে বর্তমানকে পেরিয়ে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চ'লে গেছে। সুলক্ষণার যেন সবটা গুলিয়ে গেল। রেল-পথের কোন্ মুখটা কাশীর দিকে, আর কোন্টা কলকাতার দিকে, সে যেন আর কিছুতেই ঠাহর করতে পারলোনা।

সহসা নীলু পিছন থেকে এসে তা'কে ঠেলা দিয়ে বললে, মা, মাগো ?

সুলক্ষণা ফিরে তাকালো। চোখে যেন তা'র হেমন্ত আকাশের একটুখানি ঝাপসা নীল ছায়া নেমে এসেছিল। কিন্তু সে পলকের জন্য। তারপরই সে বললে, কিরে ? কি হয়েছে ?

নীলু বললে, আন্না আর উজি ওদের ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিল চিনি চুরি করতে। আন্নাটা এমন পাজি, মামীমার ঘর নোংরা ক'রে ফেলেছে !

কী সর্বনাশ ! তুই শিগগির এক বালতি জল আন্, নীলু।—বলতে বলতে সুলক্ষণা ছুটলো ভাঁড়ার ঘরের দিকে।

পরবর্তী দৃশ্য বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। ভাঁড়ার ঘর পরিষ্কার ক'রে বেরিয়ে আসবার মুখেই নিভাননী গিয়ে হাজির। তাকে সহসা দেখে

একটু থতিয়ে সুলক্ষণা বললে, এই ভাই, বেশী ছেলেপুলে হবার কী জ্বালা খ্যাখো। দিইছি ভাই তোমার ভাঁড়ার ঘর ধুয়ে মুছে। যা, যা দূর হ এখান থেকে।—ব'লে সুলক্ষণা মেয়ে ছুটোকে তাড়া ক'রে গেল।

যাক গে, এতে আর কি হয়েছে।—ব'লে নিভাননী নিজের মনে রোষ ও ক্ষোভ দমন ক'রে চ'লে গেল। তা'র চ'লে যাবার পরমুহূর্তেই ভেড়ি এসে ঢুকলো ভাঁড়ার ঘরে। বললে, মা, ওই কল্‌সীতে গুড় আছে, একটু দাওনা ?

সুলক্ষণা তেড়ে গেল তা'কে। বললে, মারবো মুখে ঝাঁটা তোর।

কিন্তু ভেড়ি শুনলো না। মাকে এড়িয়ে তখনই গিয়ে ঘরে ঢুকলো এবং মানা শোনবার আগেই একটা কল্‌সীতে হাত ডুবিয়ে এক খাবল নতুন গুড় তুলে নিয়ে বাইরের দিকে চ'লে গেল।

উমাপতিবাবু শান্তভাবে ওৎ পেতে বসেছিলেন। ভেড়িকে দেখেই বললেন, এনেছিস্ ?

হ্যাঁ বাবা, এই নাও।—ব'লে ভেড়ি হাত বাড়ালো।

উমাপতিবাবু তা'র হাত থেকে খানিকটা গুড় ছিনিয়ে নিয়ে টপ ক'রে মুখে ফেলে দিয়ে চোখ বুজলেন। বললেন, আঃ।

গেনি দাঁড়িয়ে সমস্তটা লক্ষ্য করছিল। উমাপতি চোখ খুলে তা'র দিকে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, একঘটি জল আনতো, মা!

পরদিন সন্ধ্যার পর স্বামীকে একটু আড়ালে পেয়ে নিভাননী বললে, তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন, শুনি ?

হারাধন আড়ষ্ট হয়ে বললেন, প্রাণভয়ে!

প্যাঁচামুখে আবার মস্করা!

মুখ বিকৃত ক'রে নিভাননী বললে, বাড়ীখানাকে শুয়োরের খোঁয়াড়

ক'রে তুললে। মাগিটা হদ্দ নোংরা, ছেলেমেয়েক'টা তেমনি অসভ্য! ওরা যাবে কবে, শুনি?

হারাধন বললেন, জানিনে ভগবান ওদের কবে সুমতি দেবেন!

নিভাননী দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, হতচ্ছাড়িরা আমার গেনিকে দুদিন ধ'রে মেরে আধমরা করলে। ইঁদারার মধ্যে একটা বালতি আর একটা পেতলের ঘটি দিলে ফেলে। ভাঁড়ার ঘরটা একেবারে তচনচ করলে!—তারপর স্বামীর কাছে আর একটু এগিয়ে এসে পুনরায় সে বললে, মাগিটা খায় একেবারে কুলি-মজুরের খোরাক। তোমাকে একটা কথা বলবো, রাগ ক'রোনা কিন্তু।

হারাধন বললেন, আমার বাবার সাধ্য কি রাগ করবো?

নিভাননী চুপি চুপি বললে, যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী! মাগিটা কাল রাত্তিরে আমাকে লুকিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে একবাটি দুধ খেয়ে ফেললে গা? আমি গিয়েছিলুম পা টিপে টিপে···দেখেই আমি অন্ধকারে স'রে গেলুম!

হারাধন সরসকণ্ঠে বললেন, বটে। আর স্বামীটি কেমন?

নিভাননী বললে, ও লোকটা মিটমিটে শয়তান! আজ দুপুরবেলা ওদের খাইয়ে-দাইয়ে চান্ করতে গেছি, ফিরে এসে দেখি ওর মেজ মেয়েটা রান্নাঘর থেকে ভাজামাছ চুরি ক'রে পালাচ্ছে। আমি কিচ্ছু বলিনি গো। ওমা, জল আনতে এসে দেখি, ইঁদারার পাশটায় দাঁড়িয়ে লোকটা মাছের কাঁটা চুষছে। কী ঘেন্নার কথা গা!

হারাধন কি যেন মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন, পায়ের শব্দ পেয়ে দুজনেই চুপ ক'রে গেলেন। সুলক্ষণা হেলতে দুলতে এসে দাঁড়ালো। কিছু বলবার আগেই স্থূল দেহ নিয়ে সে থপ করে সেখানেই বসে পড়লো। বললে, খেলে-দেলে আজকাল আর নড়তে পারিনে, ভাই। দস্যিরা ঘুমিয়েছে, তাই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসতে এলুম। তোমরা খাবে কখন্ বৌ?

নিভাননী বললে, আমাদের খাওয়া চুকতে একটু বেশী রাত্তির হয়।

একটা উদ্‌গার তুলে স্থলক্ষণা বললে, বেশ, আমাদের বাদ দিয়োনা যেন!—বলে নিজের রসিকতায় নিজেই সে হাসলো।

হারাধন তা'র হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না, একটু কষ্টই হোলো।

নিভাননী একবার আকাশের দিকে তাকালো। স্থলক্ষণা বললে, তোমার এখানে খাওয়া-দাওয়াটি বেশ। ঘি কত ক'রে সের এখানে?

দু টাকা।

গাওয়া ঘি ত?

নিভাননী উত্তর দিল না।

স্থলক্ষণা বললে, দুধ কত ক'রে কেনো?

চার সের টাকায়।

আর গুড়?

হারাধন বললেন, গুড়ের নাগ্‌রিটে আমার এক বন্ধু দিয়েছেন!

অম্‌নি?—স্থলক্ষণা আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললে, কী চমৎকার গুড়ের খোসবায়! একেবারে কালোসোনা! হারুদা, আমি ওই গুড়ের নাগ্‌রিটা নিয়ে যাবো কিন্তু। তাছাড়া সের পাঁচেক ঘি, গোটাকত ফুলকপি আর কিছু শাকসব্জি আমার সঙ্গে দিয়ো।

নিভাননী অলক্ষ্যে স্বামীর গায়ে একটা প্রবল চিমটি কাটলো। সম্ভবত হারাধনের শরীরের সে-জায়গাটায় কালশিরা পড়ে গেল। অত্যন্ত ফাঁপড়ে পড়ে তিনি বললেন, আচ্ছা দেখি কি হয়!

মোটা শরীর নিয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকা চলে না। স্থলক্ষণা সেখানেই আঁচল বিছিয়ে কাৎ হলো। বললে, খেয়ে দেয়ে একটু না গড়ালে আজকাল আর পারিনে।

নিভাননী বললে, স্থদে আসলে খেয়েছ দেখছি!

সুলক্ষণা বললে, সুদটা কি, বউ?

হারাধন আবার অস্বস্তিবোধ করলেন। নিভাননী হেসে উঠে বললে, আসল খাওয়াটা ডান হাতে আর সুদটা হোলো বাঁ-হাতে!

কথাটায় একটা কুটিল কটাক্ষপাত ছিল, কিন্তু স্থূলাঙ্গিনী সুলক্ষণার পক্ষে সেটা বোধকরি বোধগম্য হেলো না। সে বললে, আর ভাই, অরুচিতে ফের কষ্ট পাচ্ছি, দেখছ ত। তবু তোমার এখানে এসে মুখটা কিছু বদলাতে পারা গেল। কিছুদিন এখানে থাকলে শরীরটাতে জোর পেতুম। ওঁর শরীরও ত তেমন ভালো নয়, এইরকম নিরিবিলিতে থেকে একটু ভালো-মন্দ খেতে পেলে উনিও সেরে ওঠেন!

সুলক্ষণার কথায় একটা প্রচ্ছন্ন আবেদন ছিল, ভদ্র-পুরুষের মন তাতে সাড়া না দিয়ে পারে না। হারাধন বললেন, তা না হয় তোমরা এখানে থাকোনা কিছুদিন, সুলক্ষণা!

সুলক্ষণা কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, নিভাননী মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে ব'লে উঠলো, আহা তোমার এক কথা! একটা সংসারের ঘরুনী গিন্নি, বিদেশে পড়ে থাকলে কি তা'র চলে?—এই ব'লে সে স্বামীর গায়ে আর একটা চিম্‌টি দিল।

হারাধন বললেন, তা বটে!—ব'লে চুপ করে গেলেন। তাঁর বেমক্কা প্রস্তাবের উপর স্ত্রীর কঠোর শাসন আপাতত যে স্থগিত রইলো, এটা তিনি মনে মনে অনুভব করলেন। ভীত হয়ে উঠলেন।

সুলক্ষণা বললে, না ভাই, থাকলে আমার চলবে না। বড় জোর আর একটা দিন থাকতে পারবো! কি জানো বৌ, হারুদা আমাকে সেই সেকালে খুব ভালো বাসতো কিনা, তাই বলছে!

হারাধন দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন পাথরের মতো ব'সে, কিছু মাত্র সাড়া দিলেন না। নিভাননী বললে, আর ভাই, ওঁর আবার

ভালোবাসা! পদ্মপত্রে নীর! এই আছে এই নেই। ছুটি থাকলে দিন রাত বুনো মোষের মতন প'ড়ে প'ড়ে ঘুম, আর তা নৈলে ওঁর চুলের টিকিটি দেখবার যো নেই! উনি জগতে কাউকে ভালবাসেন না। দেখছ না ভাই, আমার হাড় ক'খানা জ্বলে-পুড়ে গেল?

সুলক্ষণা হেসে বললে, বৌকে বুঝি একটুও যত্ন আত্তি করোনা, হারুদা? খাওয়া দাওয়া কিছু দ্যাখোনা বুঝি?

যোগাসনে উপবিষ্ট হারাধন বললেন, দেখি বৈকি! ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা ত ওঁর আঁচলেই থাকে। চুরি ক'রে খেলেও ত পারেন!

সুলক্ষণা সহসা কাষ্ঠহাসি হেসে উঠলো। এক সময়ে হাসি থামিয়ে সে বললে, বাঃ এবাড়ীটায় চাঁদের আলো পড়ে ত খুব? একটি মেয়ে নিয়ে তোমাদের ছোট সংসার, বেশ চমৎকার আছো ভাই!—আচ্ছা এখন উঠি বৌ, সকাল সকাল শুয়ে পড়িগে।

সুলক্ষণা দুই হাতের উপর ভর দিয়ে ভারী দেহটাকে কোনমতে তুলে সেখান থেকে চ'লে গেল। গেল একটু বিমর্ষ হয়ে।

নিভাননী চুপি চুপি বললে, বিদেয় হ'লে বাঁচি বাবা, আমাদের পনেরো দিনের ভাঁড়ার দুদিনেই শেষ হয়ে গেল। শুয়োরের পাল!

চাঁদের আলোর দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে হারাধন ভাবছিলেন, এইবার বুঝি স্ত্রীর হাতে তাঁর লাঞ্ছনাটা সুরু হয়; সুতরাং নিভাননীর মেজাজটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য তিনি বললেন, সুলক্ষণা বোধ হয় খায় বেশী, তাই অত মোটা।

মোটা ব'লে মোটা? নিভাননী নাক সিঁটকে বললে, ঠিক যেন জলহস্তী। তেলা-তেলা গা, ঘাড়ে-গর্দানে এক! মাগি ম'লে গরুর গাড়ী ছাড়া উপায় নেই। চর্বি গ'লে গিয়ে শ্মশানের চুলো নিবে যাবে! হ্যাঁ গা, তুমি নাকি কোন্‌কালে ওই মাগিকে ভালবাসতে?

নিস্তেজ কণ্ঠে হারাধন বললেন, তাই ভাবছি!

তোমার আর মরণ হয়নি কোথাও? কী রুচি তোমার?

তাই ত ভাবছি!

নিভাননী বললে, মাগির আস্পদ্ধা শোনো। দুপুরবেলা [illegible]স ভাত গিলতে-গিলতে আমাকে গদগদ হয়ে বলছিল, বৌ, তোমাদের [illegible]রান্দার দেয়ালে কা'র ছবি ঝোলানো রয়েছে জানো? আমি মুখ তুলতেই বললে, আমার কুমারী বয়সের ফটো। হারুদাকে উপহার দিয়েছিলুম। আমি ভাবলুম, মাগি মিছেকথা বলছে বুঝি!

হারাধন বললেন, না মিছে নয়, সত্যিই দিয়েছিল।

কই, আমাকে আগে বলোনি ত? উনুনে পোড়াতে দিতুম?

আমার কি ছাই মনে ছিল? ছোটবেলাকার ছেলেমানুষি!

নিভাননী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তুমি যে আস্ত উজবুক, নৈলে কালকেই আমি ওদের তাড়াতে পারতুম! ওঠো, খাবে চলো, রাত হয়েছে!—বলে সে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেল।

স্ত্রীকে অনুসরণ করার জন্য হারাধন উঠি-উঠি করছিলেন, এমন [illegible] অদূরে জ্যোৎস্নায় মৃদুগতি জলহস্তীর বিপুল ছায়াটা পুনরায় দেখা [illegible]। হারাধন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকালেন।

সুলক্ষণা এগিয়ে এল। বললে, খেতে যাওনি, হারুদা?

হারাধন বললেন, এই যাই—

হাসিমুখে সুলক্ষণা বললে, তোমার মনে আছে হারুদা, তোমার পাত থেকে একবার মাছ কেড়ে খেয়েছিলুম? সে আজ কতকালের কথাই হোলো!

হারাধন বললেন, তোমার যদি আবার ক্ষিদে পেয়ে থাকে, তুমি বসতে পারো আমাদের সঙ্গে, সুলক্ষণা!

সুলক্ষণা বললে, রক্ষে করো হারুদা, তোমার কেমন বউ তা'হলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না! এবেলা দেখলুম, দুধের বাটিছুটো কোথায় যেন সরিয়ে ফেলেছে! আর ওরই বা দোষ কি বলো, আমার উনি থেকে আরম্ভ ক'রে ভেড়ি পর্যন্ত সবাই এক-একটি ক্ষুদে রাক্ষস!

হারাধন অসীম নৈরাশ্যের সঙ্গে একবার জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের দিকে তাকালেন। পুরাতনকালের প্রণয়োপাখ্যানটি আজ কোন্ অবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে, সেই কথাটা তিনি বোধ হয় ভাবছিলেন।

সুলক্ষণা বললে, তোমার কাছে আর বলতে লজ্জা কি? ওঁর কি-আর একটা কাজ এতদিনে জুটতো না! ঠিক জুটতো। কিন্তু কি জানো, দিনরাত ওঁর রান্নাঘরের চারপাশে আনাগোনা, কেবল খাবার চেষ্টা! ছেলেমেয়েগুলোও তাই—রাঁধতে সবুর সয়না!—এই ব'লে সে হাসলো। হেসে পুনরায় বললে, আমিও তেমনি ধূর্ত্ত, রেঁধে বেড়ে আজকাল নিজেই চারটি খেয়ে নিই। দেরী ক'রে কি শেষকালে এই কাহিল শরীর নিয়ে শুকিয়ে মরবো?

হারাধন একবার অলক্ষ্যে তাঁর কৈশোর-প্রণয়িনীর দিকে তাকালেন। বললেন, সে ত সত্যি কথা! খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটায় নিঃস্বার্থ হওয়া মোটেই কাজের কথা নয়!

ওধার থেকে নিভাননীর উচ্চ আওয়াজ পাওয়া গেল, ওগো, ভাত দিয়েছি এসো। বড্ড বেড়ালের উৎপাত, শিগগির এসো।

যাই। —হারাধন সাড়া দিলেন।

হাসিমুখে চুপিচুপি সুলক্ষণা বললে, বেড়াল নয় হারুদা, ওটা বৌ তামাসা ক'রে বলছে। দেখছ না, আমা আর বুজি ওদিকে গিয়ে অন্ধকারে ঘুরছে? কিছু হাতসাফাই না ক'রে কি আর ওরা ঘুমোবে? —যাক্‌গে, একটা কথা তোমাকে বলছিলুম, হারুদা।

হারাধন মুখ তুলে বললেন, কি বলো!

সুলক্ষণা বললে, এই বেলা বৌ নেই! তোমাকে আড়ালে ব'লে রাখি কথাটা!—দ্রুতকণ্ঠে সে পুনরায় বললে, অবস্থা ত সবই দেখলে হারুদা। মাস দুয়েকের মধ্যেই আমি আঁতুড়ে যাবো, তখন যদি তুমি দয়া ক'রে আমাকে গোটা পঁচিশেক টাকা পাঠিয়ে দাও! আঁতুড়ে শুয়ে একটু ঘি-দুধ না খেলে আমি কিছুতেই এ-যাত্রা বাঁচবো না, তোমাকে ব'লে দিলুম, হারুদা!

প্রার্থনাটা শুনে হারাধনের গলার ভিতর থেকে কেমন একটা বমির ভাব উঠে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে যাবার সময় তিনি বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা দেবো, তুমি ভেবোনা, সুলক্ষণা।—বলতে বলতে তিনি ঊর্ধ্বশ্বাসে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

পরদিনের ইতিহাসটা পূর্বদিন দুটির পুনরাবৃত্তি ব'লেই সেটা সংক্ষিপ্ত। তবে নতুনের মধ্যে হোলো এই, সারাদিন ধ'রে যাবার উদ্যোগ ও আয়োজন চলছিল। আগামীকাল সকালের দিকে অতিথিদের যাত্রা।

অবস্থাটা রাত্রের দিকে এমন দাঁড়ালো যে, নিভাননীর সঙ্গে সুলক্ষণার মুখদেখাদেখি বন্ধ হোল, এবং হারাধন তাঁর অবসরকালটা বাইরে বাইরে কাটালেন এই আশঙ্কায়, পাছে উমাপতিবাবুর মুখোমুখি তিনি পড়ে যান। বাকি রইল এ-বাসাটার দুখানা ঘরের ঘরকন্না। কিন্তু ঘর দুখানায় দুর্বৃত্তরা এমনি জোর-জুলুমের রাজ্যপাট বসিয়েছে যে, নিভাননীর পক্ষে সে দুখানা ঘরে প্রবেশ সাধ্যাতীত। বিষধর সর্পিণীর মতো ফোঁস ফোঁস ক'রে সে ঘর দুখানার চতুর্দিকে নিষ্ফল আক্রোশ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। অবশেষে অনেক রাত্রে শত্রুদলের হাতে ঘরকন্নার দায়িত্ব সমর্পণ করতে বাধ্য হয়ে হারাধনবাবু স্টেশনের ওয়েটিং রুমে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, এবং

নিভাননী আর কোথাও জায়গা না পেয়ে গিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে। সেখানে মরা উনুনের পাশে আঁচল পেতে শুয়ে স্বামীর প্রতি আক্রোশ ও আত্ম-গ্লানিতে তার চোখে বার বার জল আসতে লাগল। সেরাত্রে সে জলস্পর্শ করলো না।

সকাল হোলো। ওয়েটিং রুমের বেঞ্চে শুয়ে হারাধনের এক সময় তন্দ্রা ভাঙলো। প্রথমেই তিনি ভাবলেন, আজ সকালে যদি আবার চাল, ডাল, তেল, ঘি খরচ ক'রে অতিথিদের জন্য নিভাননীকে রাঁধতে হয়, তবে ত্রিভুবনে আর তাঁর পক্ষে কোথাও অক্ষত দেহে বাঁচবার উপায় থাকবে না। সুতরাং তিনি স্থির করলেন, সকাল সাড়ে আটটায় যে গাড়ীখানা কলকাতার দিকে যাবে সেইখানায় সুলক্ষণাদের পার করতেই হবে। দুপুর বেলাকার এক্স্প্রেসখানার জন্য অপেক্ষা করা কিছুতেই আর চলবে না। তিনি বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছিলেন।

সকাল সাতটা নাগাদ তিনি গিয়ে বাসায় ঢুকে ডাকলেন, কই, সুলক্ষণা কোথায় ?

এই যে, হারুদা। —ব'লে সুলক্ষণা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

তোমাদের এখুনি যেতে হবে, গাড়ীর সময় হয়েছে।

ওমা, সে কি গো, এখনো যে বউ রান্না চড়ায়নি ?

কিন্তু আর ত সময় নেই, সুলক্ষণা ?

সুলক্ষণা বললে, কিন্তু তুমি কাল যে বললে, আজ দুপুর বেলাকার গাড়ী ?

হারাধন থতিয়ে বললেন, সে-গাড়ী কলকাতার দিকে যাবে না।

সুলক্ষণা ভারি দুঃখিত হোলো। বললে, রাত্রের গাড়ীতে গেলে হয় না, হারুদা ?

হা আমার কপাল !—হারাধন বললেন, সে-গাড়ী কবে উঠে গেছে ! আর কোনো গাড়ী এ-স্টেশনে থামে না, সুলক্ষণা। এই গাড়ীতেই

তোমাদের যেতে হবে। সুতরাং দশ মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে নাও।

এ-বেলাকার আহারাদির আর কোন উপায় হোলো না! অত্যন্ত বিমর্ষ ও বিষণ্ণ মনে উমাপতিবাবু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাছে ওরা দুজনে আর কোনপ্রকার অনুরোধ ক'রে বসে, এজন্য হারাধনবাবু সেখান থেকে একপ্রকার পালিয়ে গেলেন।

ভিতর মহলের দিকে গিয়ে তিনি নিভাননীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঘরসংসার ফেলে নিভাননী তখন অদৃশ্য হয়েছে। বোঝা গেল, স্টেশন মাস্টার মহাশয়ের বাসায় গিয়ে বিপন্নের মতো সে আশ্রয় নিয়েছে। ওরা বিদায় না হ'লে এ-বাড়ী সে আর মাড়াবে না।

বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদার পর অতিশয় দুঃখিত মনে সুলক্ষণা প্রস্তুত হোলো। একরাশ পালং শাক, একঝুড়ি ফুলকপি, এক হাঁড়ি প্যাঁড়া, এক নাগরি গুড়, এক টিন ঘি, একঘটি দুধ ইত্যাদি বিবিধ খাদ্যসামগ্রী সহ ক্ষুধার্ত বালকবালিকার পাল নিয়ে যখন উমাপতিবাবু ও সুলক্ষণা বাসা থেকে বেরিয়ে স্টেশন প্লাটফরমে গিয়ে উঠলো, তখন বেলা আটটা বেজে গেছে।

পোষাকটা গায়ে চড়িয়ে হারাধনবাবু ঘোরাফেরা করছিলেন। তাঁকে এতক্ষণ পরে কাছে পেয়ে সুযোগ বুঝে সুলক্ষণা বললে, কই, বৌকে আর দেখতে পেলুম না, হারুদা? সে গেল কোথায়?

হারাধন বললেন, বলতে পারিনে ত।

তার কাছে বিদায় নেওয়া হোলো না কিন্তু।

থাক্,—আমি ব'লে দেবো।

হারুদা?—ব'লে সুবিপুলা সুলক্ষণা তা'র পান-খাওয়া কালো দাঁতের মাড়ি বা'র ক'রে একবার হাসলো। বললে, তুমিই আমাকে যা একটু ভালোবাসো, হারুদা!

তা'র কথা ও হাসি খুবই অর্থপূর্ণ। হারাধন তা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন, কিছু চাই তোমার সুলক্ষণা?

সুলক্ষণা বললে, ঠিক ধরেছ, ভারি চালাক তুমি! বলছিলুম কি, তুমি এখানকার ইস্টিশান মাস্টার, আমাদের বিনা টিকিটে তুমি গাড়ীতে তুলে দিতে পারো না, হারুদা?

হারাধন বললেন, তা হয়ত পারি। কিন্তু পথে কোথাও ধরতে পারে, সেটা ঠিক নয়! টিকিট ক'রে যাওয়াই ভালো।

সুলক্ষণা বললে, তা হ'লে আমাদের টিকিটটা তুমিই ক'রে দাও হারুদা। হাতে আমাদের কিছু নাই। লক্ষ্মীটি, দাও।

মুক্তি পাবার আর কোনো পথ খোলা নেই। সুতরাং হারাধন নিজের খরচে ওদের টিকিট করতে ছুটলেন। ওদিকে ফ্ল্যাগ ডাউন দিয়েছে, গাড়ী আসতে আর বিলম্ব নেই!

দেখতে দেখতে গাড়ী এলো, হারাধনও টিকিট নিয়ে দৌড়ে এলেন। কিন্তু সহসা অদূরবর্তী বাসা থেকে নিভাননীর তীব্র দীর্ঘ কণ্ঠস্বর শুনে হারাধন চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি উমাপতিবাবুর হাতে টিকিট ক'খানা গছিয়ে হারাধন বললেন, আচ্ছা, উঠুন তবে আপনারা গাড়ীতে। সুলক্ষণা, আমি তবে যাই। কিছু মনে ক'রো না।

হারাধন ছুটলেন বাসার দিকে। সুলক্ষণা গলা বাড়িয়ে বললে, মনে রেখো আমাদের, হারুদা। আবার আমরা একসময়ে আসবো। আমার আঁতুড়ের টাকাটা ভুলোনা যেন।

ওদের গাড়ী ছেড়ে দিল।

হন্তদন্ত হয়ে হারাধন বাসায় এসে ঢুকলেন। বললেন, কি গো, কি হোলো? বলি, হয়েছে কি তাই বলো না?

চিৎকার ক'রে নিভাননী তখন কাঁদতে আরম্ভ করেছে—ওগো, আমার

এক হাঁড়ি আমসত্ব চুরি ক'রে নিয়ে গেছে···আমার নতুন কম্বল, বিছানার চাদর···তোমার ঘড়িটা···গেনির জামাগুলো···দুটো কাঁসার বাটি···আমার পুজোর সময়কার দামী শাড়ীখানা···ওগো, ওরা আমার সর্বনাশ ক'রে গেছে···মর্, মর্, মর্, ওলাউঠো হোক আমসত্ব খেয়ে···

হারাধন বিঘূর্ণিত মস্তকে কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর ধড়াচুড়ো খুলে ফেলে একখানা গামছা জড়িয়ে সোজা চ'লে গেলেন ইঁদারার দিকে। সামনে ছিল ভরা জলের বালতি। সেই জলে ঘটি ডুবিয়ে হারাধন হুড় হুড় ক'রে নিজের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, আঃ!

অন্ধ

ভোর থেকে আকাশটা ছিল ঘোরালো। বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটাগুলি উড়ে চলেছে পূবে হাওয়ার ঝাপটায়। মেঘলোকে পথহারা এক-আধটা পাখী তীরবেগে কোথা থেকে কোন্ দিকে চলেছে। ঈশানের মেঘ ছুটছে অগ্নিকোণের দিকে, তা'রই সঙ্গে চাপা ঝটিকা আর্তনাদ করে উঠছে থেকে থেকে। সকালবেলায় পূব আকাশটা অন্ধকার, মধ্য আকাশ থেকে একটা ধূসর কুটিল আলো নেমে এসেছে ঈশানের ভ্রূকুটির মতো।

জানকীবাবু স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ওগো, আজকে আর বাজারে গিয়ে কাজ নেই। ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দাও, তাড়াতাড়ি চারটি খেয়ে ঝড় ওঠবার আগে আফিসে যাই।

স্ত্রীর সাড়া পাবার আগেই কড়-কড়-কড় গুড়ম করে আকাশটা একবার ডেকে উঠলো। জানকীবাবু বললেন, পুরনো একতলা বাড়ি, কি জানি কি হয়! কাল রাত থেকেই মেঘ ডাকছে, জোরে বৃষ্টি নামলে ভরসা পেতুম। —ওরে, ধর্ ধর্—কাপড়খানা উড়ে যায় পাঁচিল পেরিয়ে—কইরে, রুণু? রুণু গেল কোথায় গো?

ছাদের উপর থেকে জবাব এলো, এই যে বাবা, কাপড় তুলছি—যাই।

রান্নাঘর থেকে শারদা মেয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে খুন্তিখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। চেঁচিয়ে বললেন, যাই কি না? এক ঘণ্টা হোলো ছাদে উঠেছিস, একখানা কাপড় ক'বার উল্টে শুকোতে দিস—শুনি? কথায় কথায় অত বড় মেয়ের ছাদে গিয়ে আড্ডাবাজি? বলি, ধানের

ভাত কি আমি খাইনে? তুই আমার পেটে হোসনি? নাড়ি-নক্ষত্তর বুঝিনে তোর?

আহা হা—জানকীবাবু মধ্যস্থ হয়ে বললেন, লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড কেন? হয়েছে কি? তোমার গলার আওয়াজ শুনলেই বানপ্রস্থ নিতে ইচ্ছে করে! অত বকৃছ কেন মেয়েটাকে?

শারদা বিকৃত মুখে বললেন, ও, মেয়ে নিয়ে এবার বুঝি তোমার ভ্যালাইপনা আরম্ভ হোলো? ভালো চাও ত' মেয়ের ছাদে ওঠা বন্ধ করো, বললুম। আমি কি তোমার বাঁদী যে, সারাদিন মেয়ের পেছনে গোয়েন্দাগিরি ক'রবো?

আবার কি উৎপাত আরম্ভ হোলো, শুনি?

শারদা গলা নামিয়ে বললেন, ওপাশের ওই জিতু ছোঁড়াটা আবার মেয়েটার পেছন লেগেছে···কী আস্পদ্দা!

জানকীবাবু বললেন, কেন গো, এই যে ঘরামীকে ধরে এত খরচ করে বেড়া দিলুম, আবার কি হোলো?

বেড়া! দর্মার বেড়া ও-ছোঁড়া কি মানে? ছুরি দিয়ে ফুটো করে ওপাশ থেকে রুণুর দিকে চেয়ে হাসে—কাল আমি স্বচক্ষে দেখলুম।—বলি শুনছিস? ওরে পোড়ারমুখী, আবাগি, শতেক খোয়ারি···আয়, নেমে আয় বলছি ছাদ থেকে?

ছাদের সিঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে মায়ের মন্তব্য রুণু এতক্ষণ শুনলো কান পেতে। এবার মুখচোখ যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে একরাশ জামা কাপড় নিয়ে হনহন করে নেমে এলো। ঝঙ্কার দিয়ে বললে, দেখলে বাবা মায়ের গলা কেমন ষাঁড়ের মতন? যেন বাজখাঁই!—এই নাও, এই আমার মাথা আর মুণ্ডু! এত হাওয়ায় কাপড়-চোপড় ছাদে দেওয়া কেন শুনি? এখানা ধরি ত' ওখানা যায় উড়ে—এখানা সামলে ছুটি ওখানার

দিকে! হাওয়ার ঝাপটায় যদি প'ড়ে যেতুম ছাদ থেকে? আর আমি পারবো না ছাদে যেতে, কক্ষনো না···এই বলে দিলুম! তোমার ছাই-পাঁশ কাপড়-চোপড় ভিজে গোবর হয়ে থাকুক।—বাবারে বাবা, এত বকুনি? এই আমি চললুম,—নাবো না, খাবো না,—শুধু প'ড়ে থাকবো। আমার মরণ হয় না কেন?—ঝড়ের মতো কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে রুণু ঘরের ভিতরে চলে গেল। বলা বাহুল্য, নিজের মুখের ভাবটা গোপন করাটাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

বাতাস উঠেছে প্রবল বেগে। দর্মার বেড়াটা আলগা বাঁধা—সেটা বাতাসের ঝাপটায় নড়বড় করছে, সেটার আয়ু অতি কম। সেইদিকে একবার তাকিয়ে মা ও বাবা ঘরের মধ্যে এলেন। জানকীবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে শান্তভাবে বললেন, হ্যাঁরে, ও বাড়ির ছোঁড়াটা নাকি আবার উৎপাত আরম্ভ করেছে?

রুণু উপুড় হয়ে পড়েছিল। এবার মুখ ফিরিয়ে বললে, কই, কোথায়?

ত্যাখ্, রুণি, মিথ্যে বললে এখুনি ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো কিন্তু—শারদা শাসন ক'রে উঠলেন—দর্মার বেড়া ফুটো হোলো কেমন ক'রে শুনি?

রুণু মুখ বেঁকিয়ে বললে, আহা, কী বুদ্ধি তোমার! এই বুদ্ধির জন্যেই বাবার আজ এমন অবস্থা! বুড়ো ইঁদুরগুলো কড়িকাঠের মাচায় উঠে তোমার পাকা কুমড়ো খেয়ে যায়, আর তারা বুঝি দর্মার বেড়া ফুটো ক'রে এধার ওধার করে না?

কিন্তু ফুটোর মধ্যে চোখ দিয়ে ছেলেটা হাসছিল কেন তোর দিকে চেয়ে?

মা?—ব'লে রুণু একেবারে ফুলে উঠলো—কী মিথ্যুক তুমি গো?

ফুটোয় কারো চোখ থাকলে হাসি বুঝি দেখা যায়? ও বেড়াল, বাবা, বেড়া বেয়ে উঠে ইঁদুরের দিকে তাগ করছিল।

শারদা বললেন, হুঁ! বেড়ালের চোখ! ইঁদুরের দিকে তাগ! আচ্ছা, আজ শনিবার, উনি আসুন আফিস থেকে। বেড়ালে কেমন ক'রে ইঁদুর ধরে আজ দেখে নেবো।—এই বলে তিনি দুমদুম করে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

একটা দমকা বাতাসের বেগে ঘরের দরজা ও জানলার কপাটগুলো ঠিক সেই সময়ে ঝপাৎ-ঝপাৎ ক'রে বন্ধ হয়ে গেল ও তারই দাপটে এই জরাজীর্ণ একতলা বাড়ির ভিত পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠলো। কড়িকাঠের কোণে একখানা বালির চাপড়া ছিল আলগা, সেখানা ঝপ ক'রে ধ্বসে পড়লো তক্তাপোষের একপাশে। জানকীবাবু ও রুণু একসঙ্গে চমকে উঠলেন। বাইরে আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে।

জানকীবাবু বললেন, যাই হোক না কেন, এসব ছেলেমানুষী ভালো নয়—এই ব'লে মেয়েকে আর কিছু না ব'লে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি পুনরায় চেঁচিয়ে উঠলেন—নিলে, নিলে—ওরে মাছটা নিয়ে গেল—ওগো—

শারদা বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে, রুণু এলো দৌড়ে। শারদা উচ্চকণ্ঠে বললেন, এ কেমন মানুষের বেড়াল গো? জ্যান্ত মাগুর মাছটা জীইয়ে রেখেছি কাল থেকে—দূর দূর—পোড়ারমুখো—

রুণু তীরবেগে ছুটলো বিড়ালের পিছু পিছু। কলতলার পাশ দিয়ে খামারের এদিকে এসে তাড়া দিতেই বিড়ালটা মাছটা মুখ থেকে ফেলে ছুটলো একদিকে। রুণু মাছটা কুড়িয়ে নিল, কিন্তু একথাটা সে জানে, এ-বাড়ির এদিকের অংশটা তাদের সীমানার বাইরে। সে তাড়াতাড়ি চ'লে যাবার চেষ্টা করলো।

তা'র গলার আওয়াজ পেয়ে জীতু এলো বেরিয়ে। গলা বাড়িয়ে ডেকে বললে, দিদি, ও বড়দিদি—শুনছ? আমাদের বেড়াল মারতে ওদের মেয়ে এধারে আসে কেন জিজ্ঞেস করো দেখি?

রুণু হাসি চাপলো। বললে, বেড়ালটা যায় কেন আমাদের ওধারে? জ্যান্ত মাছটা মুখে ক'রে পালিয়ে এলো—দাম লাগে না? আদরের বেড়ালকে লোকে শাসন ক'রে রাখে না কেন?

বড়দিদি হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন। বললেন, রাগ করছ কেন ভাই?

রাগ করবো কেন, বলুন? তবে আপনার ভাইদের একটু সাবধানে কথা বলতে বলবেন। এই দেখুন না, মাছের জন্যে বাবার হয়ত আজ খাওয়াই হবে না। আমাদের ত' আর পুকুর নেই যে, মাছ অমনি আসে!

জিতু বললে, বড়দিদি, তুমি ওদের ব'লে দাও, মাছের দাম দিয়ে দেওয়া হবে। আর, আমার বেড়ালকে যদি ওরা মারতে পারে ত' মারুক, কিন্তু বাড়ি ব'য়ে এসে ঝগড়া করাটা খুব বাহাদুরী নয়।

ওই যাঃ, তরকারীটা বুঝি পুড়ে গেল—ব'লে বড়দিদি দ্রুতপদে রান্নাঘরের দিকে চ'লে গেলেন। কিন্তু তাঁর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের একটা দমকা দাপটে কলতলার ওদিককার করোগেটের চালাটা কড়-কড় ক'রে একেবারে কাৎ হয়ে পড়লো। জিতু আর রুণু দুজনেই দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে লক্ষ্য ক'রে হেসে ফেললো।

আওয়াজ শুনে এপাশ থেকে শারদা ব'লে উঠলেন, রুণু, কোথা গেলি? তুই চলে আয় ওধার থেকে। ওদের সঙ্গে বেয়াড়াপনায় তুই পারবি কেন মা?

রুণু সাড়া দিয়ে বললে, এই যে মা, এসেছি।—এই বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে একটি ছোট্ট কাগজের গুলি ছুঁড়ে দিল হেসে জিতুর পায়ের কাছে, তারপর চক্ষের পলকে সে এধারে চলে এলো।

শারদা দাঁড়িয়েছিলেন রান্নাঘরের বারান্দায় এবং স্বামীর দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে ওধার থেকে মেয়ের কড়া কড়া কথাগুলি শুনছিলেন। এবার রুণুকে দেখে বললেন, বেশ করেছিস ওদের ঝাল ঝেড়ে দিয়ে। আমার পেটের মেয়ে বটে ত'! আরও দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারলিনে?

রুণু আনন্দে গদগদ হয়ে হাসছিল।

ওদিকে আকাশের ভয়াবহ অবস্থা দেখে জানকীবাবু ঘর-বা'র করছিলেন। ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছিল। করোগেটের চালাটা ওদিকে মচমচ্ করছে। দেখতে দেখতে প্রবল বাতাসের ঝাপটে দুই বাড়ির মাঝখানকার কাঁচা বেড়াটা মড়মড় করে কাৎ হয়ে পড়লো। রুণু ছুটে এলো, শারদা এলেন। রান্নাঘরের পাশে দাঁড় করানো ছিল দুটো বাঁশ, সেগুলো বায়ুবেগে টলতে টলতে দড়াম ক'রে পড়লো এসে উঠোনের মাঝখানে। জলের বালতিটা ছিল একপাশে, বাঁশের ঘায়ে সেটা ঝনঝন করে উল্‌টে গেল।

এই প্রকার একটা কোলাহলের হৈ চৈ হতেই ওপাশে জিতু, তা'র দিদি, বুড়ি পিসিমা—সবাই এলো ছুটে। এমন একটা হাস্যকর অবস্থা দেখে রুণু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। বড়দিদি হাসলেন এবং তাঁর সঙ্গে জিতুও উঠলো হেসে হো হো করে। অনেক পরিশ্রম করে দর্মার বেড়া দিয়ে এ-বাড়ির এই অংশটার আবরু রক্ষা করা গিয়েছিল, কিন্তু ঝড় এসে আবার একাকার ক'রে দিল।

শারদা ও জানকীবাবু গম্ভীরমুখে সমস্তটা লক্ষ্য করলেন। ওরা চ'লে যাবার পর জানকীবাবু বললেন, মুস্কিল হলো, নতুন বেড়া দেবো কেমন ক'রে বলো দেখি?

শারদা বললেন, যেমন ক'রে হোক দিতেই হবে! অত বড় মেয়েকে ত' আর আলগা রাখতে পারিনে! তা ছাড়া এতকাল ধ'রে এ বাড়িতে আছি, এ বাড়ি ছেড়ে যাবো কোথায়?

তা ত' জানি, কিন্তু বাড়িটা কত পুরনো হয়েছে দেখছ ত'? এটাকে ভেঙে নতুন করে না গড়লে আর থাকাও যায় না!

অত টাকা পাব কোথায় শুনি? মেয়ের বে দিতে হবে না? ভাড়া পাও ত' মাত্তর পনেরো টাকা।

জানকীবাবু বললেন, তুমি ত' আবার ধরেছ, ভাড়াটেকে উঠিয়ে দিতে!

শারদা বললেন, সাধে কি বলি? ওই ছেলেটা যে জ্বালিয়ে মারলো!

কিন্তু এই ধ্বসা-গলা বাড়িতে পনেরো টাকায় আর কেউ আসবে না, তা মনে রেখো। —ওই দেখো, উত্তর দিকের ভাঙা পাঁচিলটা হাঙরের মতন হাঁ ক'রে রয়েছে। চোরের আনাগোনা বন্ধ করবে কি দিয়ে? তার ওপর এই যুদ্ধের সময়! জিনিসপত্রের আগুন দর!

ঝড় উঠলো আকাশ অন্ধকার ক'রে। দু'চারটে বৃষ্টির ফোঁটা চাবুকের মতো এসে পড়তে লাগলো। এ পাশের বারান্দার পাশে একটা জানলার একখানা কপাট ভাঙা, বাতাসের বেগে সেই কপাটখানা যেন বুক চাপড়াচ্ছে। আজকের সমস্ত দুর্যোগটাই যেন এই ক্ষুদ্র গৃহস্থটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লেগেছে। যুদ্ধ যে-দেশেই বাধুক, আজকের এই ঝড় যেন এই বাড়িটির জরাজীর্ণ ভগ্ন জীবনযাত্রার উপরে প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ যুদ্ধ যেন নিতান্ত অর্থহীন নয়!

রান্নাঘরের চালাটা ছিল গোলপাতার। সেটার একটা অংশ ঝড়ের দাপট সইতে পারলো না, খুঁটির বাঁধন থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। শারদা সেই দৃশ্য দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন। দর্মার বেড়ার কোলে একখানা সরু তক্তার উপর ছিল তাঁর পূজাহ্নিকের সরঞ্জাম—সেগুলো এবার হুড়মুড় ক'রে কাৎ হয়ে পড়লো। দেওয়ালের পেরেকে খান-দুই-চার কুলো-

ডালা আটকানো ছিল, সেগুলো ছিটকে প'ড়ে একদিকে গড়িয়ে গেল। রুণু সেইদিকে তাকিয়ে জানকীবাবুকে লুকিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে লাগলো।

কিন্তু ঝড়ের কোনো বিরাম নেই।

জানকীবাবুর আফিস যাবার সময় হয়ে এলো। কিন্তু তাঁ'র স্নানাহার এখনো কিছুই হয়নি। আকাশের অবস্থা দেখে তিনি তাঁর কর্তব্য ঠিক ঠাহর করতে পারছিলেন না।

কিন্তু যে কোনো প্রকার অবস্থাই ঘটুক না কেন, পাশাপাশি দু'টি গৃহস্থর মাঝখানটিতে আবরুর যে-প্রাচীর, সেটির ব্যবস্থা এখনি না করলে কিছুতেই চলবে না। যুদ্ধ চলুক, আকাশ প্রমত্ত হোক, ঝড়ে সকল আবর্জনাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাক্, মানুষের বিশ্বাস আর সংস্কার চূর্ণবিচূর্ণ হ'তে থাকুক—কিছু যায় আসে না। কিন্তু এই ছোট্ট গৃহস্থটির চিরাচরিত প্রত্যেকটি ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতেই হবে, তা'র এতটুকু নড়চড় হ'লে চলবে না। গোলপাতার চালার যে অংশটুকু নষ্ট হয়েছে, সেটুকুর জন্য চারটি খড় কেনা দরকার। কড়িকাঠের পাশে যেখানে বালি খসেছে, সেইটুকুর জন্য খানিকটা বালি কিনে আনতে হবে। করোগেটের চালাটা আর একটা খুঁটির সাহায্যে দাঁড় করিয়ে না দিলেই চলবে না। যে-জানলাটার একখানা কপাট নেই, সেটার জন্য পুরনো কড়ি-বরগার দোকান থেকে একখানা তক্তা কিনে আনতে হবে। আর ওই দর্মার বেড়াটা—ওটার ব্যবস্থা না হলেই নয়।

ওটা এক্ষুনি করা চাই—বুঝলে?—শারদা বললেন, তোমার আফিস যাওয়া হোক চাই না হোক। ওটা হতেই হবে।

জানকীবাবু বললেন, কেমন ক'রে হবে? ঘরামি কোথা?

ঘরামি? ওই অতটুকু কাজে? আমি কি মরেছি? ওই যে আঁদাড়ের

পাশে অতগুলো ভাঙা টিন প'ড়ে রয়েছে—ওগুলো এনে দিই। খানিকটা দড়ি আর গোটাকতক পেরেক দিচ্ছি এনে,—পারবে না তুমি?

ওতে কি মজবুত হবে?

কাজ চললেই হোলো। যেমন ক'রে হোক ঠেকো দিয়ে রাখো।—ওগো, ওই ছাখো কালো বেড়ালটা আবার এলো ম্যাও ম্যাও ক'রে। জানিনে বাপু, এই ঝড় এখন ভালোয় ভালোয় কাটলে ' হয়—দূর, দূর হ—

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। জানকীবাবু বললেন, কে?

আজ্ঞে বাবু, আমি দীনু ধোপা—কাপড় এনেছি।

শারদা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তুমি আর সময় পেলে না, দীনু? এখন বেরোবার সময় তুমি এসে দাঁড়ালে? এত ঝড়···বৃষ্টি···

আজ্ঞে এসে পড়েছি কিনা—

ওগো, তুমি যেয়ো না ওর সামনে। আ মর—বেরোবার সময় ধোপা, ভিখিরী, নাপতে—যত ছোটলোকের ভীড়। ওদের মুখ দেখে বেরোলে যদি বিপদ আপদ ঘটে?—রুণু, ওকে বল্ কাপড়গুলো রেখে এখনি চ'লে যেতে—

দীনু বললে, আজ্ঞে মা, একটা কথা ছিল—

কি শুনি?

আমি আর কাপড় কাচবো না—কলকাতার সব লোক পালাচ্ছে—আমিও বাড়ি যাবো—দাম চুকিয়ে দিন্।

জানকীবাবু বললেন, আফিসের সবাই বলছিল, কলকাতায় নাকি বোমা পড়বে।

বোমা কি, বোমা কেমন, কা'রা ফেলবে, কেন ফেলবে—এসব জানার জন্য শারদার কোনো কৌতূহল অথবা উদ্বেগ ছিল না। কেবল একটু

চিন্তিত হয়ে বললেন, মরুকগে, তোমাকে আবার সেই মাদুলিটা পরিয়ে দেবো। আজ শনিবারের বারবেলা, আজই ভালো দিন। আমাদের আর বোমায় কি করবে? —দাঁড়াও, টিন আর দড়ি আমি এনে দিচ্ছি— বেড়াটা বেঁধে দাও দেখি যা হোক ক'রে? —এই ব'লে শারদা কোমর বেঁধে গেলেন আঁদাড়ের দিকে ভাঙা ও মরচেপড়া টিনের টুকরোগুলো গুছিয়ে আনতে।

প্রবল ঝড়ের বেগে কোথাও কিছু স্থির ক'রে উঠবার উপায় নেই। শারদা সেই ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে টিনের টুকরো খুঁজতে লাগলেন, এবং এদিকে দরজার খুঁটি ধ'রে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে উদ্দেশ ক'রে জানকীবাবু বললেন, হ্যাঁ গো, দড়ি দিয়ে টিন বাঁধবো কেমন ক'রে?

স্ত্রী ওধার থেকে বললেন, সে-বুদ্ধি আমি বাৎলে দেবো, তুমি থামো। —ওরে রুণু, তুই যা, মাথায় এক ঘটি জল ঢেলে এসে রান্নাটা দেখ্‌গে।

আচ্ছা, যাই মা—

মাথায় এক খাবল তেল আর একখানা কাপড় নিয়ে রুণু সোৎসাহে চ'লে গেল কলতলার দিকে। উৎসাহটা অবশ্য অপ্রকাশ্য। কারণ এ বাড়ির কলতলাটার মতো স্বাধীন জায়গা আর কোথাও নেই। এ পাশে একটা দর্মার বেড়া দেওয়া, আর ওপাশে একখানা চট ঝোলানো; দুটি রোদে-বর্ষায়-হিমে একেবারে জরাজীর্ণ। কিন্তু তবু কলতলাটা নিরিবিলি। এখানে জলের কলটা খুলে দিয়ে ঝরো ঝরো আওয়াজের মধ্যে দাঁড়িয়ে রুণুর গানের গলাটা বেশ খুলে যায়। শারদা কতদিন মানা করেছেন, বড় মেয়ের পক্ষে গান গাওয়া ভালো নয়; জানকীবাবুও গানের প্রতি কিছু বিরূপ—কিন্তু রুণুকে শাসন ক'রে রাখা সম্ভব হয়নি।

মিনিট দুই কলতলায় দাঁড়িয়ে স্নানের আয়োজন করতে করতেই সহসা এক সময়ে অদৃশ্যলোক থেকে একখানা শক্ত বলিষ্ঠ বাহু বেড়ার ফাঁক

দিয়ে ভিতরে এসে পৌঁছলো। রুণু হাসিমুখে একবার দেখলো সেই হাতের মুঠোয় রয়েছে একখানা দামী সাবান। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে পলকের মধ্যে সেই সাবানখানা মুঠোর থেকে খুলে নিয়ে রুণু সেই কঠিন বাহুর উপর একটি কিল বসিয়ে দিল। পুরুষের হাতখানা তখনই আবার অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

স্নান সেরে রুণু উঠে এলো এবং তারপর আর কিছুক্ষণ তা'র সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ওদিকে ঝড়বৃষ্টির ভিতরে টিনের বেড়া বাঁধার কাজে স্বামীস্ত্রী বিশেষভাবে ব্যস্ত। সহসা এক সময়ে শারদা কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। হাতের কাজ ফেলে পা টিপে টিপে গেলেন রান্নাঘরে উঁকি মারতে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, হ্যাঁলা রুণি ?

গদগদ হাসিমুখে রুণু মুখ ফিরিয়ে বললে, কি মা ?

শোবার ঘর ছেড়ে রান্নাঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিস্ কেন, শুনি ? চোখ কোন্ দিকে ?

রুণু বললে, রান্নাঘরে বুঝি চুল আঁচড়াতে নেই ?

শারদা বললেন, হুঁ, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, জানিস ? অত হাসি কেন, বল্ দিকি ?

তোমার এক কথা, মা ! আয়নাটা হাতে ধ'রে আছি দেখতে পাও না ? যাও বেড়া বাঁধোগে—আমার পেছনে লাগতে এলে কেন ? তোমার দেখছি ভীমরতি হ'তে আর দেরি নেই !

আয়নাটা রুণুর হাতে ছিল, শারদা লক্ষ্য করেন নি। একটু অপ্রস্তুত হয়ে তিনি থেমে গেলেন। বললেন, চুল আঁচড়াতে বেলা কাবার করলি ! ওদিকে ভাত পু'ড়ে গেল, দেখতে পাসনে ?—এই ব'লে তিনি প্রস্থান করলেন।

ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, সর্বাঙ্গ ঘেমে, হাতে-পায়ে টিনের

খোঁচা লাগিয়ে স্বামীস্ত্রী দু'জনে মিলে ঘণ্টাখানেক ধ'রে যখন একটি ছেলে আর একটি মেয়ের স্বাভাবিক স্বাধীনতার মাঝখানে প্রাচীর তুলতে ব্যস্ত, সেই সময়ে বাইরে কা'র গলার আওয়াজ পাওয়া গেল—ওহে জানকী, বাড়ি আছ নাকি ?

জানকী সাড়া দিলেন, কে ? গুরুপদ নাকি ?

হ্যাঁ, আজ তুমি আফিস যাবে না ?

হাতের কাজ ফেলে জানকী কালি-ঝুলি ধুলো-কাদা মেখে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন, এসো এসো গুরুপদ, ভেতরে এসে দাঁড়াও—আজ কি ঝড় আরম্ভ হয়েছে বলো ত' ? দশ বছরের মধ্যে এমন ঝড় ত' আমরা দেখিনি হে ! বৃষ্টিতে ভিজে গেছ দেখছি ।

গুরুপদবাবু বললেন, আজ আফিস যাবে না ?

না ভাই আজকের দিনটা আর বেরুবো না, ছুটিই নিলুম। বড়বাবুকে তুমি ভাই ব'লে দিয়ো, ভারি পেটের ব্যামো হয়েছে। উঠতে পারছে না !

কিন্তু তুমি এত কালি-ঝুলি মাখলে কোত্থেকে হে ?

জানকীবাবু বললেন, সে আর ব'লো না—গলা নামিয়ে পুনরায় বললেন, ও-পাশের ছেলেটা ভারি বিরক্ত করছে কিছুদিন থেকে। মেয়েটা বড় হয়েছে ত' ! তাই দালানের মাঝখানে একটা টিনের বেড়া দিচ্ছিলুম।

গুরুপদ বললেন, দালানের বেড়া ত' দিলে, ছাদ বাঁধবে কি দিয়ে ? তারপর জানলা আছে ঘুলঘুলি আছে, কলতলা আছে, বেড়ার ফাঁক আছে, গলি দিয়ে আনাগোনা আছে, রাত্তেভিতে ইশারা ইঙ্গিত আছে, চিঠি ছোড়াছুড়ি আছে—কোন্‌[illegible]সামলাবে বলো দেখি ?

জানকীবাবু বললেন, এসবই যদি না সামলাই একে একে, মেয়েটার মাথা খারাপ ক'রে দেবে ও-ছোকরা। জানো না ত', ছেলেটা ভারি শয়তান !

গুরুপদ যাবার উদ্যোগ ক'রে বললেন, দশটা পাঁচ হলো, আর সময় নেই। কিন্তু ঘরকন্না ত' সামলাচ্ছ, ওদিকে যুদ্ধের খবর কিছু রাখো? কাগজ পড়ার বালাই ত' তোমার নেই!

জানকী বললেন, কেন বলো দেখি?

বোমাপড়ার ভয়ে কাল একদিনেই চল্লিশ হাজার লোক ক'লকাতা থেকে পালিয়েছে! আজ বর্মা ও মালয়ের অবস্থা খুব খারাপ। আর দু'চার দিনের মধ্যে হয়তো ক'লকাতা উজাড় হয়ে যাবে।

ব্যস্ত হয়ে জানকীবাবু বললেন, আফিস করবো কেমন ক'রে হে?

আর আফিস, প্রাণ নিয়ে বুঝি চম্পট এবার দিতে হয়! বাজারে আর কয়লা মিলছে না, দেখছ ত'? দোকানপাট সব উঠে যাচ্ছে!

ঝড়ের একটা উদ্দাম ঝাপট জানলা দরজায় আওয়াজ ক'রে চলে গেল। তারই বেগে নতুন বাঁধা ভাঙা টিনের নড়বড়ে বেড়াটা ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে উঠলো।

গুরুপদ বললেন, এবার যাই যা হোক ক'রে ছাতাটা মাথায় দিয়ে—বুঝলে, ওসব বেড়া-টেড়া এখন রাখো, চেয়ে দেখো চারিদিকে। এই ব'লে তিনি সেই ঝড়-জলের মধ্যেই দ্রুতপদে পুনরায় গেলেন।

জানকীবাবু তাড়াতাড়ি ভিতরে এলেন। এসে দেখলেন, অপটু হাতের তৈরি বেড়ার পরিণাম যা হয় তাই হয়েছে। আবরণটা যেমন হাস্যকর হয়ে উঠেছে, বাঁধনটাও তেমনি হয়েছে আলগা। তার, দড়ি আর পেরেক—এ-দিয়ে আর যাই হোক, ভাঙা টুকরো টিন জোড়া লাগে না। তাছাড়া সেই টিন দাঁড়াবে কিসের জোরে? বাঁকারির একটা কাঠামো আছে বটে, কিন্তু কাঠামোটাকে শক্ত ক[illegible] করাবার কোনো ভিত্তি নেই। ফলে, বেড়া নামক পদার্থটা এলোমেলো আর অগোছালো হয়ে গেছে।

একটা বাতাসের ঝাপট আসতেই জানকীবাবু আর শারদা দৌড়ে গিয়ে সেই টিনের বেড়াটা সামলে ধরলেন। শেষ অবধি যদি ভাঙা টিন বাতাসের বেগে উড়ে পড়ে, তবে আহত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু এতক্ষণ পরে শারদার নিজের মুখেই হাসি দেখা দিল। বললেন, তুমি পুরুষমানুষ হয়েই জন্মেছ, তাছাড়া তোমার আর কোনো ক্ষমতাই নেই।

মুখ বিকৃত ক'রে জানকীবাবু বললে, তুমিই তো বললে, তোমার আবরু চাই, বেড়া চাই, মেয়েকে সামলানো চাই। আধপয়সার মুরোদ নেই, কেবল বেড়াবাঁধা, আর ঘর সামলানো। বাঁধতে বাঁধতে শতপাকে প্রাণটা এবার বুঝি হাঁপিয়েই মরে। এত বাঁধন আর সহ্য হয় না। —বলতে বলতে তিনি ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় ধপ্‌ ক'রে বসে পড়লেন। এবং তার মিনিট-দুই পরে তাঁর চোখের সামনেই আর একটা দমকা বাতাসের ঝাপটায় সেই ভঙ্গুর বেড়া হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়লো। এধার ওধার একাকার হয়ে গেল। ওপাশ থেকে উচ্চকণ্ঠে জিতুর হাসির শব্দ এপাশে শোনা গেল, এবং এধারে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসির আওয়াজ বন্ধ ক'রে রুণু ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে তক্তার উপরে লুটিয়ে পড়লো!

দ্বিতীয় ঝড়ের ঝাপ্‌টা এলো দিন চারেক পরেই—কিন্তু সেটা য[illegible]। শত্রুর উড়োজাহাজ নাকি পূর্ববঙ্গের কোন্‌ আকাশে কে দেখেছে, [illegible]তরাং কলকাতায় বিমান আক্রমণ হ'তে আর বিলম্ব নেই! শহরের নানা পল্লীতে ইতিমধ্যেই ভাঙন ধরেছে, সাহেবরাও নাকি গোপনে ট্রেণে উঠে শহর ত্যাগ করছে, মাড়োয়ারি আর ভাটিয়ারা গদি বন্ধ করছে। কোনোদিন গ্রামের চেহারা যারা দেখেনি, তারাও দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে গ্রাম্য অঞ্চলে—যেখানকার আকাশে কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা নেই। শহরে যানবাহন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি ইত্যাদির ভাড়া অনেক বেড়ে গেছে। বহু দোকানদার যেমন-তেমন মূল্যে

দোকান বিক্রি ক'রে সরে পড়েছে। যে-কোনো দেশে, যে-কোনো অবস্থায়, যে-কোনো অর্থব্যয়ে—কেবলমাত্র প্রাণভয়ে হাজারে হাজারে কাতারে-কাতারে নরনারী পালাতে লাগলো। লক্ষ লক্ষ লোক ভিড় ক'রে ছুটলো হাওড়া আর শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে। কলেজের ছাত্র, ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার, অবসরভোগী, বেকার, নারী শিশু বৃদ্ধ—অর্থাৎ ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত মূর্খ, ধনী গরীব, ভিখারি অন্ধ, পানওলা, ফিরিওলা,—সকল জাতি ও সমাজের লোকরা কেবল ছুটছে একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায়। তা'রা প্রশ্ন করলো না, বিচার করলো না, ভাবলো না,—কেবল পালিয়ে চললো পাগলের মতো।

এ পল্লীটাও প্রায় দেখতে দেখতে খালি হয়ে এলো। জানকীবাবু হন্তদন্ত হয়ে আফিস থেকে ফিরলেন। তিনি হাঁপাচ্ছেন, আর্তনাদ করছেন। বললেন, ওগো শুনছ শিগ্‌গীর সব গুছিয়ে নাও—কাল··· কালই পালাতে হবে কলকাতা থেকে—

ওমা, সে কি গো?

আর কোনো কথা নয়, ভাববার আর সময় নেই—যেতেই হবে। রাত জেগে সব গোছগাছ করো।

যাবো কোথায়?

তা জানিনে, যেখানে হোক যাবো, যেখানে জায়গা পাই। আগে রেলগাড়িতে উঠে বসি, তারপর অন্য কথা। আমাদের ক্ষিতীশবাবু গিয়ে কোন্ এক গাঁয়ে একটা গোয়াল ভাড়া নিয়েছে।

শারদা বললেন, জিনিসপত্রের কী দশা হবে?

কতক ফেলে যাবে, কতক সঙ্গে নেবে। মনে রেখো, কলকাতায় ফেরবার আর কোনো ঠিক নেই! কে জানে, হয়ত একদিন ফিরে দেখবো শ্মশান হয়ে গেছে।—পরশু দিন হরিহর পালিয়েছে সপরিবারে একখানা

গরুর গাড়িতে, কাল পালিয়েছে গুরুপদরা। আর আমরা কি থাকতে পারি? এর পর কলকাতা থেকে আর হয়ত বেরোতেই পারবো না।

শারদা বললেন, তোমার আফিসের কি হবে গো?

আফিস! —জানকীবাবু বললেন, তুমি দেখছি কচি খুকি। প্রাণ নিয়ে পালাতে হচ্ছে, এখন আফিস? আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম, তা জানো? টাকাকড়ি সব নিয়ে এলুম পোস্টাফিস থেকে তুলে! —নাও, নাও সব গুছিয়ে, আজকের রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটলে হয়। দেখছ না রাস্তায় আর লোক চলাচল নেই! পাড়াময় নিশুতি! পথে আলো নেই! যাও, মায়ে-ঝিয়ে মিলে সব গোছাওগে। মালপত্তরগুলো নিয়ে কোনো রকমে ট্রেণে উঠতে পারলে হয়। জানিনে কোথাকার টিকিট কাটবো।

শারদা চলে গেলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই যেন আতঙ্কের ছায়া নেমেছে! চারিদিকে কেমন যেন বুকচাপা বিষণ্ণতা—একটা যেন অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট বিপদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে চারিদিকের গুপ্ত চক্রান্তে। আজ রাতটা কাটাতে পারলে জানকীবাবু যেন বেঁচে যান।

রুণু বললে, বাবা, পিসিমারা কি করবে?

জানকীবাবু বললেন, তোর পিসের সরকারী চাকরি—তাঁকে এক পা'ও নড়তে দেবে না। মরুক্ আর বাঁচুক তাদের থাকতেই হবে।

রুণু বললে, কিন্তু মণ্টুর ত' আজো জ্বর ছাড়লো না, ওকে কেমন ক'রে ট্রেণে তুলবে, বাবা?

জানকীবাবু বললেন, তুলতেই হবে যেমন ক'রে হোক। জ্বরে না হয় আরো কিছুদিন ভুগবে, প্রাণে বাঁচবে ত'? তোর মা গেল কোথায়?

মণ্টুকে দুধ-সাবু খাওয়াচ্ছে।

জানকীবাবু বললেন, বাজে সময় নষ্ট করছ কেন তোমরা? ওসব রাখো, এদিকের ব্যবস্থা করো। থলেগুলো পেড়ে মালপত্র গুছিয়ে রাখো।

অতঃপর এই ক্ষুদ্র পরিবারের তিনটি বিচারবুদ্ধিহীন প্রাণী এ বাড়ির ঘরকন্না ওল্টাবার দুরূহ কাজে কোমর বেঁধে লেগে গেল। ঝাঁটা, বালতি, কানেস্তারা, ঘুঁটে-কয়লা, হাঁড়ি-কলসী, ছেঁড়া জুতো, রবিবর্মার ছবি, পানের কৌটো, শিল-নোড়া, টিনের বাক্স, থালা-বাসন, উনোনের শিক, মাছ কোটার বঁটি, তারের ঝোলা, গাড়ু ইত্যাদি বহুবিধ মূল্যবান সম্পত্তিগুলো গভীর রাত অবধি পরিশ্রম ক'রে থলের মধ্যে দেওয়া হলো। ছেঁড়া কাঁথার সঙ্গে জীর্ণ মাদুরখানা জড়িয়ে নারকেল দড়ি দিয়ে বিছানা বাঁধা হয়ে গেল। কাঠের তক্তা যাবে সঙ্গে, কয়েকখানা করোগেটের টুক্‌রো, খানকয়েক দর্মা, তোলা উনোন, আম কাঠের বাক্স, তোরঙ্গ—এ সব অত্যাবশ্যকীয় আসবাব ফেলে গেলে কিছুতেই চলবে না। সমস্ত রাত জেগে একটির পর একটি মোট তৈরী হোলো। এ বাড়ির আকর্ষণ আর কিছু নেই। কত অভ্যাসের দাসত্ব, কত সংশয়, চিত্তগ্লানি, ক্ষয়ক্ষতি জীবনযাত্রার কত অসংখ্য খুঁটিনাটি, কত কুসংস্কার আর অজ্ঞানের জটিল জাল—এই বাড়িটিকে ঘিরে এতকাল ধ'রে চলে এসেছে—আজ একটা অন্ধ অনিশ্চিত প্রাণভয়ের তাড়নায় সবগুলো যেন মন থেকে খসে পড়লো। আজ কলতলার আবরু, বেড়া-বাঁধার সমস্যা, রান্নাঘরের উঁকিঝুঁকি, সমাজনীতির কচকচি, চরিত্র রক্ষার তদ্বির-তদারক—এগুলো কিছুই যেন আর মনে সাড়া দিচ্ছে না। মৃত্যুভয়ের একটা প্রবল ঝাপটায় সবগুলো যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

শেষ রাত্রের দিকে ক্লান্ত হয়ে রুগ্ন ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসে শারদা কাঁদছিলেন। রুণুর পরিশ্রান্ত চোখে তন্দ্রা নেমেছিল। ওধারে আতঙ্কিত জানকীবাবু অধীর উদ্বেগে ব'সে প্রভাতের প্রতীক্ষা করছিলেন। ভোর বেলায় এ বাড়ির ওধার থেকে জিতুর উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। একখানা সংবাদপত্র হাতে নিয়ে সে ঘোষণা করছিল—"বর্মায় ভীষণ বিমান

আক্রমণ, কলিকাতা আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা—সহস্র সহস্র আতঙ্কিত নরনারীর দলে দলে শহরত্যাগ—বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহার”—

জানকীবাবু ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লেন। এদিক ওদিক তাকালেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে। আজ ভোরের আকাশ যেন হিংসায় আতঙ্কে লাল হয়ে উঠেছে তাঁর চোখে। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বললেন, এখুনি যাবো, রান্নাবাড়া কিছু নয়···এখুনি যাবো—ওগো? —

দশ টাকা ভাড়ায় একখানা গরুর গাড়ি অতি কষ্টে সংগ্রহ করা গেল। অন্ধের মতো উন্মাদের মতো তা'র ওপর মালপত্র চাপাবার হুড়োহুড়ি আরম্ভ হোলো। আর সময় নেই—হয়ত শত্রুর উড়ো জাহাজ এখনি উড়ে আসবে এদিকে, হয়ত বোমাটা দৈবাৎ তাদেরই মাথায় পড়বে। ঘরকন্না লণ্ডভণ্ড করা হোলো,—জিনিসপত্র তচনচ, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি ভাঙাভাঙি, হোঁচট লেগে পা রক্তারক্তি, থালা-বাটি মাথার বালিশ গড়াগড়ি,—যেমন তেমন ক'রে গরুর গাড়িখানার উপর তুলতে পারলেই এ যাত্রা প্রাণরক্ষা! চাকরি গেছে যাক্, বাড়িঘর আলগা প'ড়ে থাকুক, অনাবশ্যক টাকাকড়ি খরচ হোক, খাদ্যসামগ্রীর সুব্যবস্থা মুলতুবী থাক, রুগ্ন ছেলেটার চিকিৎসা না হোক—পালাতেই হবে। ভয় আসছে তেড়ে, আকাশ ছেয়ে আসছে উড়ো জাহাজ মৃত্যুর ডানা মেলে—যে কে যেখানে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো চাই।

জিতুর দিদি ভাঙা বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, কোথা যাচ্ছেন আপনারা?

শারদা বললেন, তা ত' জানিনে মা, উনিও কিছু ঠিক করেন নি। চ'লে যাচ্ছি এই শুধু জানি। তোমরা কবে যাবে?

আমরা যাবো না!

ওমা, সে কি গো?

দিদি হাসিমুখে বললেন, এরা কেউ ভয় পেয়ে পালাতে রাজি নয়!

কোমল কণ্ঠে শারদা বললেন, আমাদের মা যেতেই হবে। তা যাই হোক,—ঘরকন্না ভেঙে গেল, ঝগড়া বিবাদ ভুলে যেয়ো মা। জানিনে আমরা কোথায় ভেসে চললুম!

জিতু এগিয়ে এসে বললে, যদি আপনারা রাজি হন, আমি একটা কথা বলতে পারি।

শারদা সর্বপ্রকার মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে সাগ্রহে বললেন, কি বাবা?

জিতু বললে, আমার ছোট কাকা থাকেন রাণাঘাটে—তাঁর বাড়িতে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি।

সে ত' বেশ বাবা—দাঁড়াও ওঁকে ডেকে বলি। —ওগো শুনছ? একবার শিগ্‌গীর এসো এদিকে—

জানকীবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে এলেন। রুণু এসে দাঁড়ালো সকলের পিছনে—যাতে সহজে জিতুকে দেখা যায়। আজ আর আগল নেই, বেড়া নেই—চরিত্রনীতি রক্ষার প্রাণান্তকর তোড়জোড় নেই।

জিতু তা'র প্রস্তাব জানালো। জানকীবাবু উৎসাহে অধীর হয়ে উঠে বললেন, বাবা, তুমিই আমাদের বাঁচাতে পারো। আর কোথাও আমাদের জায়গা নেই—কখনও কলকাতার বাইরে পা দিই নি। তোমার কাকার আপত্তি হবে না? জায়গা দেবেন তিনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আপনাদের সঙ্গেই চিঠি দিচ্ছি। তিনি নিশ্চয়ই থাকবার জায়গা দেবেন···তাঁর মস্ত বড় বাড়ি!

জানকীবাবু আনন্দে কেমন যেন বিকারগ্রস্ত হাসি হাসলেন। আর্তনাদ ক'রে বললেন, আহা, সোনার ছেলে জিতু—দেখলে ত' গিন্নী—আমি তোমাকে বলেছিলুম! কী মিষ্টি কথা, কী মিষ্টি স্বভাবটি! বাবা, তুমিই আমাদের এ যাত্রা বাঁচালে। গরীব আমরা আর কী বলবো তোমাকে?

তোমরা থাকো এ বাড়িতে—ভাড়াটাড়া আর কিছুই দিতে হবে না। ওগো, নাও চলো—আর দেরী নয়। সব উঠেছে ত' গাড়িতে? কুলো ডালা, ঘুঁটে-কয়লার মোট—কিছু যেন ফেলে যেয়ো না—বলতে বলতে তিনি বেরিয়ে এলেন। বাইরে গাড়োয়ান হাঁক দিচ্ছে।

শারদা জিতুর মাথায় হাত রেখে প্রাণভরে আশীর্বাদ ক'রে এলেন।

এ ঘরে রুণু এসে গুম হয়ে বসেছিল। গরুর গাড়ির পাশে একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে তাঁদের নিয়ে যেতে। জিনিসপত্র উঠেছে গাড়ির চালে। শারদা তাঁর কোলে রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে চোখের জল ফেলে বেরিয়ে এলেন্। জ্ঞানকীবাবু হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি ক'রে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

ব'সে রইলি কেন রে? গাড়িতে উঠ্‌গে যা?

রুণু নত মুখে বললে, আমি যাবো না, বাবা।

সে কি? তুই থাকবি কোথা? —জানকীবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

রুণু বললে, ভয় পেয়ে আমি পালাবো না। তোমরা যাও, আমি থাকবো পিসিমার ওখানে।

জানকীবাবু বললেন, ওগো, শোনো তোমার মেয়ের কথা। বলছে পিসির ওখানে থাকবো!

শারদা গাড়িতে উঠে বসেছিলেন। তখন গাড়ি চলতে থাকলে তিনি যেন বাঁচেন। কোন প্রকারে স্বামীপুত্রের হাত ধ'রে রাণাঘাটে গিয়ে পৌছলে তাঁর স্বস্তি হয়। গলা বাড়িয়ে তিনি বললেন, একলা থাকতে পারবি পিসির ওখানে, রুণু?

খুব পারবো—রুণু ঘর থেকে জবাব দিল।

পথ দিয়ে তখন এ-আর-পি'র লোকেরা চলেছে দলে দলে। কাগজ-ওয়ালারা আতঙ্কজনক সংবাদ নিয়ে ছুটোছুটি করছে। মিলিটারী

লরীগুলো দৌড়চ্ছে এদিক থেকে ওদিক। অসংখ্য নরনারী চলেছে বিচিত্র যানবাহনে। মুখে মুখে পথে পথে জনরব।

জানকীবাবু চঞ্চল হ'য়ে বললেন, আর দাঁড়াবার সময় নেই,—এরপর আর হয়ত পৌঁছতে পারবো না। আমরা চললুম—তুই তবে এ বেলা জিতুদের ওখানে খেয়ে ওবেলায় পিসির বাড়ী যাস—কেমন? —এই ব'লে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। অজ্ঞানে অন্ধ হ'য়ে তিনি ছুটলেন।

গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার গাড়ি চললো একই সঙ্গে।

রুণু চুপ ক'রে এক জায়গায় কিয়ৎক্ষণ বসে রইলো। সে এখানে একবেলা থাকবে কেমন ক'রে, থাকা উচিত কিনা, শোভন কিনা—এ প্রশ্ন আজ আর উঠলো না। আজ বেড়া নেই, শাসন ও সন্দেহ নেই, সতর্ক প্রহরা নেই, আবরু রক্ষার অদ্ভুত আয়োজন নেই, এমন কি রুণুর হিতাহিত সম্বন্ধে এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কোনো বিচারবুদ্ধিরও অবকাশ রইলো না,—আজ প্রাণভয়ের তাড়নায় আত্মরক্ষার আদিম চেতনাটা প্রবল হ'য়ে উঠে সাধারণ জ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল। মা ও বাবা পালিয়ে গেলেন।

শূন্য নির্জন ঘরের দরজায় খসখস ক'রে এক সময়ে পায়ের শব্দ হোলো। জিতু ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো রুণুর সামনে। কেউ কোথাও নেই, কেউ আসবেও না এদিকে। জিতু রুণুর একটি হাত ধরে তুললো। বললে, ভয় কি? আমি পৌঁছে দেবো!

ভয়! —রুণু শান্ত ও নির্ভীক হাসি হাসলো। বললে, ভয় পেয়েছ তোমরা, পুরুষরা, তাই আমাদের বস্তাবন্দী ক'রে নিয়ে জন্তুর মতন পালাচ্ছ পাড়াগাঁয়ের গুহাগহ্বরে। মানুষের এত বড় অপমান এদেশে আর কোনো যুগে ঘটে নি।

জিতু সচকিত বিস্ময়ে রুণুর মুখের দিকে তাকালো।

রুণু পুনরায় বললে, ভয় নয়, কিন্তু ভাবছি বাবার কথা। চাকরী ছাড়লেন, সামান্য পুঁজি যা ছিল নষ্ট করলেন। জানি, ভয় একদিন ওঁর ভাঙবে, কিন্তু সেদিন আর বাঁচবার উপায় থাকবে না। মহামারী আর দুর্ভিক্ষে একদিন না খেয়ে সবাইকে মরতে হবে। এ যুদ্ধে পালানোই মৃত্যু! —এই ব'লে সে অগ্রসর হোলো, —চলো যাই—

জিতু বললে, এখনই যাবে পিসিমার ওখানে?

না —ব'লে রুণু কিয়ৎক্ষণ থামলো। তারপর পুনরায় বললে, কিন্তু একটা কথা তোমায় ব'লে রাখি। স্বাধীনতা পেয়েছি ব'লেই সাবধান হবো, মনে রেখো।

জিতু বললে, সে দায়িত্ববোধ আমার আছে রুণু, তুমিও মনে রেখো।

সেই পুরাতন

যতদূর মনে পড়ছে হরিপদর অবস্থা প্রথম দিকে একটু ভালোই ছিল। লোহার কারখানায় যারা চাকরি করে, দিন-মজুরিই তাদের সম্বল—কিন্তু হরিপদ ওদের মধ্যে টাকাকড়ি কিছু জমিয়ে অনেকটা সুযোগ সুবিধে ক'রে নিয়েছিল বৈকি।

লোহার কারখানায় ইলেকট্রিক যন্ত্রের চক্রান্ত নিয়ে কালিঝুলি মেখে যার দিন কাটে—সে একটু নেশা ভাঙ করে—এটা এমন কিছু অপরাধ নয়। কিন্তু হরিপদ যেদিন হঠাৎ বিয়ে ক'রে বসলো সেদিন সবাই একেবারে অবাক। বিয়ে ক'রে ঘর চালাবার ক্ষমতা হয়ত তার ছিল,—কিন্তু এমন সুশ্রী আর লেখাপড়া জানা পাত্রী সে কোথা থেকে নিয়ে এলো, এই ছিল সকলের কাছেই বিস্ময়। অনেকে তামাসা ক'রে বললে, এমন ষণ্ডামার্কা চেহারা তোর—মেয়েটাকে চুরি ক'রে আনিসনি ত' রে?

হরিপদ অহঙ্কার প্রকাশ ক'রে বললে, সাতপাক ঘুরে মালাটি বদলে তবে ঘরে এনেছি বাবা—হেঁ হেঁ—

তোকে মেয়ে দিল? মেয়েটির গলায় দড়ি জুটলো না?

হরিপদ বললে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! আমি ত' একটা পুরুষ বটে, —কারো চেয়ে কম নই, মনে রেখো।

স্ত্রী সুশ্রী আর লেখাপড়া জানা—কারখানার সামান্য মজুরের পক্ষে এমন কবে কা'র ঘটেছে? প্রায়ই ছুটির দিনে দেখা যায় তেলকালি মাখা হরিপদ হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে নব কলেবর ধারণ করেছে। পরণে তার ফিনফিনে ধুতি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে চকচকে নতুন জুতো,

মাথায় ফুলেল তেলের গন্ধ—হরিপদ স্ত্রীকে নিয়ে মধ্যে মাঝে কার্নিভ্যালেও যায়, এবং সেখানে চার আনা আট আনা জুয়া খেলেও সগৌরবে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরে আসে। বন্ধুরা ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে হরিপদর দিকে চেয়ে থাকে। হরিপদর জীবন-নদীতে যেন জোয়ার এসেছে। কেউ কেউ বললে, বেশ, খুব ভালো হরিপদ, তুই সংসারী হলি, তোর বদখেয়ালগুলো কমলো—এ তোর বউয়ের গুণ, বউ তোর সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! অনেক ভাগ্যি তোর।

হরিপদ বললে, যেমন তেমন মেয়ে বিয়ে করিনি, বুঝলি—বাপের এক মেয়ে, হাতে মোটা টাকা আছে।

কিছুকাল চ'লে গেল। দেখা যাচ্ছে হরিপদর পোষাক-আসাকে আর তেমন জেল্লা নেই। তার মেজাজটাও কিছু রুক্ষ। অনেকে বুঝে নিল, হরিপদ এতদিনে মোটামুটি টাকা জমিয়েছে, নৈলে পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এমন কৃপণ হোলো সে কেন! আর তা-ছাড়া লোকটার হাতে টাকা হয়েছে বলেই মেজাজটা এত গরম।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা অন্যরূপ। হরিপদর পক্ষে বিয়ে করাটা বরং সইলো, কিন্তু সংসারী হওয়াটা সইচে না। বিয়ের প্রথম দিনটা কাটলো নেশায়—কারণ স্ত্রীলোকের স্নেহের আস্বাদটা তার পক্ষে নতুন। কিন্তু এর পিছনে সাংসারিক দায়িত্ব আর কর্তব্যের চেহারাটা দেখে তার মন বিগড়ে গেল। হরিপদ ভাবলো, ভালো রে ভালো, দিব্যি নেশা ক'রে জুয়া খেলে, হাতুড়ি পিটে আর কল ঘুরিয়ে আমার সুখের জীবন কাটছিল, এ আবার কোন্ নতুন উৎপাত এসে জুটলো? এ আমি বরদাস্ত করতে পারবো না।

তার স্ত্রী সুহাসিনী কোমল প্রকৃতির মেয়ে। হরিপদর চেয়ে যোগ্যপাত্রের হাতে সে পড়তে পারতো, কিন্তু এ-নিয়ে তার কোনো ক্ষোভ নেই, সে

আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত। হরিপদ বললে, আমরা বন্ধুবান্ধব মিলে বাগানে যাবো, টাকা দাও। সুহাসিনী তখনই টাকা বা'র ক'রে দেয়। হরিপদ বললে, আজ ভালো রেস্ আছে, টাকা দাও। সুহাসিনী তখনই হাতের একগাছা বালা খুলে দিয়ে বললে, নগদ টাকা ত' নেই, বালা বাঁধা দিয়ে টাকা নাওগে।

সুহাসিনী কোনো দিন স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ করে নি। জানে প্রতিবাদ মিথ্যে। দুরন্ত পুরুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন ছোটে তখন বাধা দিতে গেলে নিজেকে চূর্ণ হ'তে হয়। সুহাসিনী কেবল স্বামীর মঙ্গল কামনা করে। মনে মনে বলে স্বামী যেমনই হোক, তা'র নিজের ভালোবাসা মিথ্যে নয়,—ভগবান যেন তাকে কোনো দিন তেমন সংশয়ের মধ্যে না ফেলেন।

তাদের বিয়ের বছর-দুই পরে একটি ছেলে হোলো এবং সেই ছেলে সম্প্রতি একটু বড়ও হয়েছে। হরিপদ তা'র পুরনো দারিদ্র্যের মধ্যে ফিরে এসেছে। দু'বেলা ভাত অবিশ্যি জোটে, কিন্তু তার আনুষঙ্গিক উপকরণ জোটে না। পরণে তার সেই ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, গায়ে হাতকাটা ময়লা শার্ট। কাজ করে সে অক্লান্ত, মজুরী তথৈবচ। নেশাটা বরাবরই আছে, তা'র সঙ্গে আরো কিছু আপত্তিজনক গতিবিধি। এদিকে সুহাসিনীর স্বাস্থ্য ভেঙেছে, গায়ে একটি অলঙ্কারও নেই, একটি পরিচ্ছন্ন জামার অভাব—ছোট ছেলেটার দুধের পয়সা জোটে না। হরিপদ মাঝে মাঝে আসে, সুহাসিনীর প্রতি জুলুম করে, হাতের কাছে যা পায় —বাইরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে' সেই পয়সায় ঘোড়দৌড়ের বাজী খেলে আসে। প্লেসের ঘোড়া উইন্-এ ধরে, এবং সর্বস্বান্ত হয়ে আবার বন্ধুদের নেশার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢোকে। বন্ধুরা বলে, চক্চকে বউ পেয়ে ক'দিনের

জন্যে নবাবী করতে গেলি, আবার সেই পুরনো জীবনে ফিরতে হোলো ত'? ওরে ভাই, আমরা জন্মেছি পাপ করার জন্যে, ওসব কি আমাদের সয়?

ঠিক বলেছিস। —ব'লে হরিপদ আবার ময়লা তাস ভাঁজতে থাকে।

কিন্তু দেখতে দেখতে হরিপদ আরো নীচের দিকে নেমে গেল। সুহাসিনী তা'র হাতে অহেতুক অপমান আর উৎপীড়ন সইতে লাগলো, কিন্তু একদিনও প্রতিবাদ করলো না। ছেলেটাও বড় হ'তে লাগলো— অনাচার, নিষ্ঠুরতা, অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের ভিতরে। এদিকে হরিপদর বর্বরতা রাশ খুলে হৃদয়হীন উন্মাদনায় চারিদিকে দাপাদাপি ক'রে বেড়াতে লাগলো।

এমনি ক'রে পরিণামে যা ঘটলো তা খুবই সাধারণ। আত্মবিস্মৃত হরিপদ একদিন কারখানা থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিরে এলো। কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে ব'সে থেকে সহসা সে রক্তচক্ষে উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে বললে, লোকে বলে তুই লক্ষ্মীমন্ত বউ? মিছে কথা। তোর জন্যেই আমার যত সর্বনাশ। বেরো তুই বাড়ি থেকে। দূর হ—

সেদিন ছেলেটার হাত ধ'রে সুহাসিনীকে পথে নামতে হোলো। হৃদয়হীন স্বামীকে সে ধিক্কার দিল না, চোখের জল ফেলেও একথা বললে না, এ অন্যায়, এ পাপ! নিরুপায় নারী কেবল মনে মনে ভাগ্যদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে পথের একদিকে চলতে লাগলো।

হরিপদ তার স্ত্রী ও পুত্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, কিছুই অন্যায় করিনি। ওরা না বিদেয় হ'লে আমার কোনো উন্নতি নেই। এবার বাঁচলুম। —এই ব'লে সে অবারিত উচ্ছৃঙ্খলতায় আবার ফিরে গেল।

মাঝে মাঝে একটি অবোধ বালকের ক্ষুধার্ত একখানি মুখ স্মরণ ক'রে সে অস্বস্তি বোধ করতো বটে, কিন্তু তাও একদিন ঝাপ্‌সা হয়ে এলো!

ভালো মিস্ত্রি হিসেবে হরিপদর খ্যাতি ছিল, সুতরাং বরাতক্রমে হঠাৎ তার একটা ভালো কাজ জুটে গেল। মাইনেটা আগের চেয়ে বেশী এবং সেজন্যে হরিপদর উল্লাস আর ধরে না। সংসারের দায়িত্ব আর নেই, স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াতে হয় না—অতএব সমস্ত টাকাটা সে অবাধে খরচ করতে পায়। সুহাসিনী অথবা তা'র ছেলের কোনো খোঁজ খবর নেবার প্রয়োজন সে মনেই করে না, মাতা পুত্র এই পৃথিবীর বিরাট লোকযাত্রার ভিতরে কোথায় তলিয়ে গেছে,—কোনো সন্ধান তা'র নেই। সেই অলক্ষণা বৌ আর অভিশপ্ত পুত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হরিপদ এ যাত্রা বেঁচে গেল বৈ কি!

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে।

সুহাসিনী তার ছেলেটিকে মানুষ ক'রে তোলার জন্য আত্মীয়পরিজন ও পরিচিত মহলের ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছে। কেঁদেছে সে অনেক দুঃখ পেয়েছে তার চেয়েও বেশী—কিন্তু তবু তা'র সিঁথির সিন্দুরটি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ঠাকুর দেবতার মন্দিরে মানৎ করেছে, ভিক্ষে ক'রে ছেলের মুখে অন্ন জুটিয়েছে—কিন্তু এ-কথা বলেনি, জীবনটা তার এবারের মতো ব্যর্থ হয়ে গেল। বরং তা'র বিশ্বাস দুঃখটা নাকি তার সার্থক হয়েছে ছেলেটাকে মানুষ ক'রে তোলার কঠোর তপস্যায়। এমন অদ্ভুত মনোভাব কেবল হিন্দুনারীর পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব।

কিন্তু এমনি তপস্যায় ক্রমে ক্রমে সুহাসিনীর অকাল বার্ধক্য দেখা দিল! কূলকিনারা নেই কোনো দিকে—তখন সে উপার্জনের পথ ভাবতে লাগলো। অসীম ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের গুণে সে সেলাই আর ডিজাইনের কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। বাঙলা দেশের বাইরে কাশী শহরের এক সঙ্কীর্ণ

গলির ভিতরে একখানি ঘর নিয়ে সুহাসিনী কোনো মতে চালাতে লাগলো। ছেলেটার বয়স তখন পনেরো !

মায়ের সে খুবই বাধ্য, লেখাপড়াও কিছু কিছু শিখেছে। কিন্তু পৈতৃক প্রবৃত্তিটা সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। জুয়া খেলতো সে লুকিয়ে, রানিং ফ্লাস খেলতো গোপন সুড়ঙ্গ পথে বন্ধুদের আড্ডায়। বাজি ধরতো সে খুব ভালো, যেন সে জন্ম থেকেই জয়তিলক প'রে এসেছিল কপালে। এক একদিন দুই পকেট তা'র ভরে যেতো টাকা পয়সায়। আড্ডার পর রাত্রে ঘরে ফিরে দেখতো, টিমটিমে আলো জ্বেলে তা'র মা জানলার ধারে ব'সে একমনে মহাভারত পড়ছে। চাঁদের আলো হয়ত এসে পড়েছে মায়ের কপালে, এবং অদূরবর্তী গঙ্গার হাওয়ায় রুক্ষ চুলগুলি উড়ছে। তার মনে হেতো, মা যেন তা'র ঋষিকন্যা! সে অপরাধীর মতন অন্যত্র চ'লে যেতো। মায়ের কাছে সে অন্যায় উপার্জনের কথা বলতে সাহস করতো না।

সহসা একদিন রাত্রে অন্ধকার গলির পথে ছেলের আর্তনাদ শুনে সুহাসিনী আঁৎকে উঠলো! তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলো, দরজার ধারে তা'র ছেলে প'ড়ে গোঁ গোঁ করছে—সর্বাঙ্গ দিয়ে তা'র রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রে ছেলে একবার ব'লে উঠলো—মা, গুণ্ডারা আমার পিঠে ছুরি মেরেছে। আমি—আমি বোধ হয় বাঁচবো না।

সুহাসিনী ছেলেকে তুলে নিয়ে গেল ঘরে। ছুরির আঘাত তা'র পিঠের শিরদাঁড়া ভেদ ক'রে ভিতর অবধি চ'লে গেছে। প্রাণের আশা কম।

হতভাগিনী নারীর চোখে সেদিন জল এলো না। সমবেদনা জানাবার মানুষ নেই, চোখের জল কেন তা'র পড়বে? শীতকালের সেই ভয়াবহ দীর্ঘ রাত তা'র কাটলো, সকাল বেলায় ছুটলো সে হাঁসপাতালে খবর

দিতে। উন্মাদিনীর মতন সে ছুটে চলেছে, এমন সময় সহসা তা'র চোখে পড়লো, একজন ব্যাধিগ্রস্ত কদাকার ব্যক্তি তা'র দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রয়েছে। একখানা হাত তা'র কাটা। সুহাসিনী চিনলো, এ তা'র স্বামী—হরিপদ। ক্ষণকালের জন্য সুহাসিনী পাথরের পুতুলের মতন থমকে দাঁড়ালো।

সে আবার পা বাড়াবে এমন সময় হরিপদ এগিয়ে এসে বললে, বৌ, দাঁড়াও। আমি তোমাকে অনেক দিন ধ'রে খুঁজছি।

সুহাসিনী প্রথমটা শিউরে উঠেছিল। কিন্তু আগে কে কাঁদবে ঠিক বুঝা গেল না। সহসা হরিপদই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে তা'র পায়ের কাছে ভেঙে পড়লো —বৌ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই।

হরিপদর কাটা হাতখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সুহাসিনী এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। হাউ হাউ ক'রে সে কেঁদে উঠলো। বললে, ওগো, শিগ্‌গির চলো, কালু বোধ হয় আর বাঁচবে না।

হরিপদ তাড়াতাড়ি চলতে পারে না, এক পা তা'র খোঁড়া। স্ত্রীর কাঁধের ওপর একখানা মাত্র হাতের ভর দিয়ে দুষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত হরিপদ কোন-মতে বাসায় এসে পৌঁছলো। কিন্তু এসে দেখলো, ইতিমধ্যে অশেষ যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত ক'রে তাদের ছেলেটির মৃত্যু ঘটেছে।

দুজনে স্তব্ধ ও নীরব। এক সময় হরিপদ ধরা গলায় ডাকলো, বৌ?

সুহাসিনী তা'র অসাড় মুখ তুললো স্বামীর দিকে।

হরিপদ বললে, কালু মরেছে আমার জন্যে। এ শাস্তি তোমার নয়, আমার। ছেলের রক্তে আমার সব পাপ যেন ধুয়ে যায়!

জড়িত কণ্ঠে সুহাসিনী মৃত সন্তানের দিকে চেয়ে বললে, এ কি আমি সইতে পারবো?

হরিপদ ধীরে ধীরে তাকে কাছে টেনে নিল! বললে, পারবে বৌ, নিশ্চয় পারবে—আমি জানি মরণকে তুমি জয় করবে, তুমি যে মহাশক্তি। চলো, আমরা অনেক দূরে অন্য কোথাও চ'লে যাই।

মৃদুকণ্ঠে সুহাসিনী কেবল বললে, তাই চলো।

কয়েকদিন

বড়দাদা থাকেন লক্ষ্ণৌতে। তিনি লিখলেন, নতুন ডাক্তারি পাশ করেছ, কিন্তু কলকাতায় পসার জমতে দেরী লাগবে। আপাতত কিছুকালের জন্যে তুমি এখানে এসে থাকো, পরে দেখা যাবে। লক্ষ্ণৌ জায়গাটা ভালো, বাঙালী সমাজে সহজে সমাদর মেলে।

বড়দাদার চিঠি পেয়ে বিনু রাজী হয়ে গেল। ডাক্তারির থেকে উপার্জনের একটা কথা আছে, কিন্তু সাধারণ পরাশ্রিত বাঙালী যুবকের মতো বিনুও উপার্জনের কথাটা তলিয়ে কোনো দিন ভাবেনি। যৌথপরিবারের অভিভাবকের তহবিল থেকে টাকা নিয়ে একদিকে সে ডাক্তারি পড়েছে, অন্যদিকে মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখা, সাঁতার শেখা, ব্যায়াম সমিতির চাঁদা দেওয়া—এই সবগুলোই সে মসৃণভাবে এতদিন চালিয়ে এসেছে। আর কোনদিকে তা'র মাথা ছিল না, সুতরাং মাথাব্যথাও কম ছিল।

অভিভাবকের সংখ্যা বেশী থাকা ভাগ্যের কথা বৈকি। বিনু নিজের ভবিষ্যতের বুস্তিটা অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে লক্ষ্ণৌ রওনা হোলো।

হাবড়া স্টেশনে তখন পূজোর মরশুম লেগেছে। সেই ভীড়ের মধ্যে কুলীর সঙ্গে দরদস্তুরের হাঙ্গামা এড়িয়ে নিজের ব্যাগ বিছানা নিয়ে বিনু ঠেলতে ঠেলতে প্ল্যাটফরমে এসে পৌছলো। হাত দুখানা তার পেশীবহুল, সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা নেওয়া তার পক্ষে কষ্টকর হোলো না। 'আন্তঃপ্রাদেশিক নরনারীর জটলার ভিতর দিয়ে নিজের জায়গাটা, এবং

রাত্রে শোবার সংস্থানটা সে একপ্রকার গুছিয়েই নিল। তৃতীয় শ্রেণীর প্রত্যেক যাত্রী যেমন তা'র চতুর চোখে স্বার্থপর স্বাচ্ছন্দ্যকে আবিষ্কার ক'রে নেয়, বিন্নুও ঠিক সেইরূপ আয়োজনে কিছুমাত্র কার্পণ্য করলো না।

গাড়ী ছাড়তে আর বিলম্ব ছিল না। কিন্তু সেই জনস্রোতের ঘূর্ণীর মধ্যে দেখা গেল, জন তিনেক কুলীর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে একটি পরিবার উদ্‌ভ্রান্তভাবে কোনো একটি কামরায় মাথা গোঁজবার চেষ্টা করছে। পরিবারের মুখপাত্রস্বরূপ যিনি একমাত্র পুরুষ, তিনি অতি বৃদ্ধ, এবং তাঁকে সামলে নিয়ে আছেন একটি বর্ষীয়সী মহিলা, তাঁদের সঙ্গে একটি শিশু বালিকা ও অপর একটি মহিলা। জিনিসপত্র, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশু মিলে সমস্তটাই বেসামাল আর অনবধান। তাঁদের অবস্থা দেখে কুলী তিনটাও তিরস্কার করতে আরম্ভ করেছে। এর পরে যদি তাদের আশ্রয় না দেওয়া হয়, তবে মনুষ্যত্বের দরবারে নালিশ আসে। ওদিকে গার্ডের বাঁশী বাজলো।

স্বার্থপর স্বাচ্ছন্দ্যকে ভুলতে হোলো। গাড়ী থেকে নেমে এলো সে আস্তিন গুটিয়ে। তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অতি দ্রুতগতিতে সে পরোপকারে মত্ত হোলো। সর্বাগ্রে উঠলেন বৃদ্ধ, তারপরে মহিলাগণ, পিছনে পিছনে পোঁটলাপুটলী, বালতি, হাঁড়ি, ফাঁসবাঁধা বিছানা, প্যাটরা—এবং তার সঙ্গে আরো যেসব আসবাবপত্র, সেগুলো তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের কাছেও হাস্যকর।

একটা নাড়া দিয়ে গাড়ীখানা যখন স্টার্ট দেবে, সেই সময় বর্ষীয়সী মহিলাটি মুখ বাড়িয়ে সহসা বললেন, ওমা, আমার থলেটা? কুলীর মজুরি চুকিয়ে বিন্নু যখন গাড়ীতে উঠবে, তা'র চোখে পড়লো সেই থলে। মোটটা একটু ভারী ছিল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বিন্নু হেঁট হয়ে দুহাতে থলেটা যখন তুলবে, সেই অবসরে একটি ক্ষুদ্র মানবিকা তা'র

চুলের মুঠি শক্ত ক'রে ধ'রে তা'র পিঠের ওপর ঝাঁপিয়ে উঠলো। সুতরাং তাড়াতাড়ি দু'টি বোঝাকে নিয়েই বিনুকে পলকের মধ্যে দরজায় উঠতে হোলো। পূর্বোক্ত মহিলাটি চাপা তিরস্কারের সঙ্গে ব'লে উঠলেন, ওমা, সবাই উঠলুম, মেয়েটার কথা মনেই নেই! ভাগ্যি, ভীড়ের মধ্যে হারায় নি —কী সর্বনাশ হোতো! তুই বা কেমন লা, মেয়েটার হাত ধ'রে উঠতে নেই? একেবারে ভুল?

বিনু চেয়ে দেখলো, যে অল্পবয়সী মেয়েটিকে তিরস্কার করা হোলো, সে ঘোমটার নীচে নিঃশব্দ নতমুখে নিশ্চল হয়ে ব'সে রয়েছে। সেখান থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কিন্তু কাঁধ থেকে মেয়েটাকে বিনু যখন নামিয়ে দিল, সে তখন খিল খিল ক'রে কল্লোলোচ্ছ্বাসে হেসে উঠলো। মাথায় তা'র ঝাঁপা ঝাঁপা ঘন কালো চুল, সিপসিপে বেতের মতন ক্ষুদ্র চেহারাটির গঠন, সুন্দর নধর মুখ, কালো কালো কৌতুকরসভরা দু'টি চোখ— মেয়েটির হাসির চূর্ণ বিচূর্ণ আওয়াজে চলন্ত গাড়ীর কামরার লোকেরাও সচকিত হয়ে উঠলো!

বিনু মনে করেছিল, যে-জায়গাটা সে হাবড়া থেকে লক্ষ্ণৌ অবধি মৌরসী মোকররি স্বত্বে নির্ব্যয় ও নির্ব্যূঢ় ভোগদখলীকার সূত্রে ভোগ ক'রে যাবে, সে-জায়গার আর চিহ্নমাত্রও নেই। মুমূর্ষু বৃদ্ধ এপাশে কাৎ হয়ে প'ড়ে একপ্রকার খাবি খাচ্ছেন, বর্ষীয়সী মহিলাটি তাঁর কাছে ব'সে মালপত্রের হিসাব নিচ্ছেন, ওপাশে কালোপাড় শাড়ীপরা তরুণীটি আগের মতো একপাশে পা তুলে ব'সে তেমনি নির্বিকার ও নির্বাক, এবং শিশু বালিকা নিশ্চিন্ত আনন্দে আপন কৌতুকরসে মত্ত,—আর তাদের জন্য সর্বস্বান্ত শ্রীমান বিনু একান্তে দাঁড়িয়ে নির্বোধের মতো লিলুয়া-বেলুড়-বালির প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে অভিভূত। এক ফোঁটা কৃতজ্ঞতা, এক বিন্দু ধন্যবাদ কোনোদিক থেকে আসবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখা গেল না।

এ যেন তাঁদের আইনসঙ্গত প্রাপ্য ছিল। সেই পাওনা পেয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত।

যাত্রীদের কলরব আর ধকল আর টাল সামলে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকার পর বিন্থু বৃদ্ধের বচন শুনলো, আমরা কাশী যাচ্ছি, বাবা। বিকল যন্ত্র থেকে যেমন ভাঙা আওয়াজ বেরোয়, এই অর্ধমৃত বৃদ্ধের কথাগুলি তেমনি। যেন আর দেরী নেই, এই গাড়ীর মধ্যেই বুঝি একটা হেস্তনেস্ত হ'য়ে যায়। বিন্থু তাঁর দিকে তাকালো, কিন্তু উত্তর দিল না।

আরো কিছুক্ষণ পরে বর্ধমান স্টেশন এলো। গাড়ী থামবার পর হাত পা ছড়াবার জন্য বিন্থু গাড়ী থেকে নামলো। ট্রেন অল্পক্ষণ থামবে, এইটুকু সময়ের মধ্যে বিন্থু এক ভাঁড় চা কিনে খেতে খেতেই গার্ডের হুইস্‌ল্ শোনা গেল। ফিরে এসে দরজায় উঠতেই এদিক থেকে ছোট মেয়েটি গিয়ে হেসে তাকে ধরলো—বাবু, আমি জল খাবো।

জল খাবে? এসো।—ব'লে তা'কে কাঁধে নিয়ে বিন্থু ছুটে চললো প্লাটফরমের কলের কাছে। তাকে জল খাইয়ে সে যখন ফিরিয়ে আনলো, দেখলো তার জামা আর কাপড় মেয়েটার খাবারের দাগে ভ'রে গেছে। কিন্তু মেয়েটা ত' জল খেয়ে খুশী হোলো! এতেই তার স্বর্গলাভ!

গাড়ী ছাড়বার পর মেয়েটা তা'কে পেয়ে বসলো। তা'র সঙ্গে গল্প করো, হাসো, তা'র তামাসায় মেতে ওঠো, তা'র প্রতি একান্তভাবে মনোযোগ দাও।—তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন বাবু, বসো!

বিন্থু বললে, বসবার জায়গা নেই যে!

এইত'—মেঝের ওপর বসো। বসো বলছি।

ক্ষুদ্র বালিকার শাসন বিন্থুকে মানতে হোলো। সহস্র পদধূলিরাশির মধ্যে বেঞ্চের নীচে মেঝের উপর সে বাধ্য হয়ে বসলো। বললে, তোমার নাম কি?

আমার নাম ছবি। ওই যে আমার মা।

তোমার বাবা কোথায় ?

ছবি বললে, আমার বাবা হারিয়ে গেছে।

উত্তরটা অস্পষ্ট, সুতরাং বিনু একবার মহিলাদের দিকে চেয়ে দেখলো। কিন্তু সেদিকটা একেবারেই অন্ধকার। ঘোমটার আড়ালে মহিলা দু'টির নাকের ডগাও চোখে পড়েনা—এবং তাঁরা তেমনিই নিঃসাড়ে ব'সে রয়েছেন। কেবল ছবির মায়ের পরণে দেখা যায়, কালোপাড় শাড়ী, আর হাতে দুগাছি সোনার রুলি। হাত দুখানি অবশ্য বিনুর বড় বৌদিদির মতো সুন্দর আর নিটোল স্বাস্থ্যে ভরা।

কিন্তু তলিয়ে কিছু ভাববার অবকাশ বিনুর নেই। ছবি তা'র ঘাড়ের উপর চ'ড়ে বললে, তুমি ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে জানো, বাবু ?

বিনু হেসে বললে, তুমি এ খেলাটা বেশ জানো, মনে হচ্ছে।

অত অল্প জায়গার মধ্যে ঘোড়া-ঘোড়া খেলাটা ছবির পক্ষে তেমন জমলো না। সে তখন তা'র গল্প আরম্ভ করলো। সেই সঙ্গে বিনুকে সে সাজাবে, চুল আঁচড়ে দেবে, ছড়া শেখাবে, ঘুমপাড়ানি গান করাবে। তা'র সঙ্গে আত্মীয়তা যেন অনেক দিনের, অনেক কালের কুটুম্বিতাটা পাকা—একজনের সঙ্গে অপরের সাক্ষাৎ যেন অনেক দিনের পর। এরপর ছবি প্রশ্ন তুললো বিনুর ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে, তা'র পকেট হাতড়ে বা'র করলে নানাপ্রকার জিনিসপত্র। টাকাকড়ি, ফাউণ্টেন পেন, হাত-ঘড়ি, রুমাল, নোটবই, চকোলেট, সুপারি এলাচ এবং আরো কিছু কিছু। বিজ্ঞের মতো ছবি এক সময় বললে, আমার কাছে থাক্, তুমি হারিয়ে ফেলবে কিনা—। আড়ষ্ট হয়ে বিনু বললে, কলম, মনিব্যাগ আর ঘড়িটা কেবল আমার কাছে থাকুক, কেমন ?

ছবি অসন্তুষ্ট হয়ে বললে, আচ্ছা, ওগুলো নিয়ে একটু খেলা করো তা'পর আমায় ফেরত দিয়ো লক্ষ্মী ছেলের মতন।

বিন্থ হো হো করে হেসে উঠলো।

সন্ধ্যার পরে ট্রেন এসে থামলো আসানসোলে। কয়েকজন গাড়ী থেকে নেমে গেল, আর তা'র চেয়ে বেশী সংখ্যক লোক উঠে এলো গাড়ীতে। কিন্তু এই সুযোগে বিন্থ বসবার একটা জায়গা পেয়ে গেল। ছবি বললে, এইবার তোমাকে ঘোড়া-ঘোড়া খেলা শেখাবো।

বিন্থ বললে, আচ্ছা—এই ব'লে সে উঠে দাঁড়ালো। পরে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখুন, এর পরে গাড়ী থামবে অনেক দেরীতে, আপনাদের খাবার দাবার যদি কিছু লাগে আমাকে আনতে দিন্।

বৃদ্ধ তা'র প্রস্তাব শুনে নিঃশব্দে চোখ বুজলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাঁরা সহযাত্রিণী, তাঁরাও রইলেন নির্বিকার। তাঁদের বিরক্তিকর ঔদাসীন্য লক্ষ্য ক'রে বিন্থর মুখে একটা কড়া কথা এসে পড়েছিল, কিন্তু কষ্টে সে নিজেকে সংযত করে রাখলো। তাঁদের অহঙ্কারটা এতই বড় যে, সাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করাও তাঁরা দরকার বোধ করেন না।

জল লাগবে কি ?—বিন্থ তথাচ প্রশ্ন করলো। কিন্তু তাঁদের কেউ ঘাড় নেড়েও উত্তর দিল না। বৃদ্ধও তথৈবচ। তাঁদের আচরণ এমনি অশিষ্ট, এমনি অসামাজিক যে রাগে আর ক্ষোভে মুখের একটা শব্দ ক'রে বিন্থ মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইলো। ছবি এসে তা'র থুঁতনিটা ধ'রে বললে, তুমি বড় দুষ্টু ছেলে, কেবল বকবক করছো।

—আচ্ছা বাবু, গাড়ী চলে কেন ?

বিন্থ মুখ ফিরিয়ে বললে, ইঞ্জিন টানে তাই চলে !

ইঞ্জিন টানে কেন ?

এত লোককে নিয়ে যাবে কিনা, তাই ইঞ্জিন টানে !

ছবি বললে, লোকেরা যায় কেন ?

তারা যায়, তাদের দরকার, তাদের যেতে হবে কিনা—এই যেমন তুমি যাচ্ছ ?

আমি যাচ্ছি কেন ?

তুমি বেড়াতে যাচ্ছ যে !

এমন সময় জন তিনেক চেকার উঠলো গাড়ীতে। সবাই আপন আপন টিকিট বার করলো, কিন্তু বৃদ্ধের দলের কোনো ভ্রূক্ষেপ সেদিকে দেখা গেল না। এবারে চেকারের প্রশ্নে হয়ত তাঁদের অটল প্রাচীরটি ভাঙবে মনে ক'রে বিনু একবার সেদিকে তাকালো, কিন্তু তার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। বৃদ্ধ অচল এবং স্থবির, তাঁর সাড়া শব্দও নেই। মহিলারা নিঃসাড় পুঁটুলির মতো নির্বিকার। কোনোদিকেই তাঁদের গ্রাহ্য নেই। বিনু যেন অস্থির হ'য়ে উঠলো। এখানে তা'র দায়িত্ব, তা'র সম্ভ্রমটাই যেন প্রধান—এবং তা'র যত মাথা ব্যথা ওদেরই জন্য। সুতরাং সে উঠে দাঁড়ালো। বর্ষীয়সী মহিলাকে উদ্দেশ ক'রে বললে, আপনাদের চুপ ক'রে থাকলে ত' চলবে না, টিকিট বা'র ক'রে দেখাতে হবে, চেকার উঠেছে।

ভ্রূক্ষেপও নেই, এতটুকু নড়াচড়াও নেই। বিনু রাগ ক'রে বললে, টিকিট কি আপনারা করেন নি ?

উত্তরে মৃতপ্রায় বৃদ্ধের একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। কঙ্কালসার হাতখানা তুলে নিজের পকেটের কাছে আনার চেষ্টা করতে গিয়ে বৃদ্ধ কাতর হয়ে পড়লেন। বিনু তখন বিরক্তি ও করুণা সহকারে এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের পকেট থেকে তিনখানা টিকিট বা'র ক'রে নিয়ে চেকারকে দেখালো। চেকার দেখে শুনে বললে, ছোট মেয়ের টিকিট কোথা ?

বিনু বললে, ওর লাগবে কি ? অত ছোট মেয়ে !

হ্যাঁ লাগবে—হাফ-টিকিট। ওর বয়স কত ?

বিনু হাসিমুখে বললে, দেখতেই পাচ্ছেন।

তিন বছরের বেশী কিনা বলুন না ?

হ্যাঁ, তা এক রকম হবে বৈ কি—ব'লে একটু নিরুপায় ভাবে বিন্থু মহিলাদের দিকে তাকালো।

চেকার বললে, আপনি এর বাবা হয়ে বলতে পারেন না এর বয়স ঠিক কত ? দিন্—টাকা বা'র করুন, ওর হাফ-টিকিট লাগবে।—এই ব'লে লোকটা রসিদ বই বা'র ক'রে কি যেন লিখতে লাগলো।

একটা আহত-বিস্ময়ে বিন্থু যেন খানিকটা নির্বোধ ব'নে গেল। সে অস্বীকার করতে পারতো, একটা হাঙ্গামা হ'তে পারতো, যাদের দায়িত্ব তাদের হাতেই ছেড়ে দিতে পারতো—কিন্তু কোনটাই তা'র পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠলো না। অত্যন্ত দুর্বল, অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে, এবং তা'র পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভদ্রতা সহকারে নিজের মনিব্যাগ থেকে কয়েকটা টাকা সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বা'র ক'রে চেকারের হাতে তু'লে দিল। চেকার রসিদ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে গেল। টাকা কয়েকটা গেল বৈ কি, এবং সে টাকা উদ্ধারেরও কোনো আশা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। ঘটনাটা ছোট, কিন্তু কে যেন সজোরে তা'র মুখে একটা চড় মেরে চ'লে গেল,—মুখখানা এখনও রি রি করছে। তা'র বলবার কিছু নেই, জানাবারও কিছু রইলো না—কিন্তু সর্বাঙ্গে একটা অস্বস্তি মেখে সে চুপ ক'রে ব'সে রইলো। চারিদিকে অসংখ্য যাত্রী কলরব কোলাহলে মুখর —কিন্তু বিন্থুর মনে হোলো, তার দিকে তাকিয়ে সকলেই যেন তা'র নির্বুদ্ধিতা নিয়ে চাপা কৌতুকে মেতে উঠেছে। মুখ তুলে আর কোনো দিকে তাকাবার সাহস তা'র নেই।

বাবু ? —ছবি এসে একান্ত অন্তরঙ্গের মতো তা'র কাছে দাঁড়ালো।

অবোধ বালিকাকে বিন্থু কাছে টেনে নিল। ছবি বললে, তুমি ব'সে আছ কেন ? খেলা করলে না ?

বিমু বললে, এখানে খেলা করা যায় না, ছবি।

কেন যায় না ?

অল্প জায়গা কি না। এখানে খেললে ওরা রাগ করবে।

তুমি রাগ করবে না ?

বিমু তা'র মুখের দিকে তাকালো। ঘণ্টা দুই আগেকার মুখের সঙ্গে এই কচি শুভ্র সুন্দর মুখখানির যেন মিল নেই। হয় এই মুখখানির কোনো পরিবর্তন ঘটেছে, নয়ত বিমুর চোখের তারায় কোনো অভাবনীয় চিত্তবৈলক্ষণ্যের ছায়া ভেসে উঠেছে। সে ধীরে ধীরে ছবিকে কোলে তুলে নিল।

ছবি বললে, এবার আমি ঘুমুবো, বাবু।

বেশ, তবে তোমার মায়ের কাছে যাও ?

ছবি ব'লে উঠলো, না না, মা যে বললে, তোমার কোলে শুয়ে ঘুমুতে ? তোমার কাছে ঘুমুবো আমি।

বিমু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। তার মনে হোলো, কোন্ এক ঘোমটার আড়াল থেকে চারটি সজাগ চক্ষু ও কর্ণ সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া লক্ষ্য ক'রে নিঃশব্দ প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। বিমু তাদের যতটা উদাসীন আর অনস্থ মনে করেছিল ততটা নয়। ইতিমধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সংযোজনা ঘটে গেছে, এটা এতক্ষণে লক্ষ্য ক'রে বিমুর তরুণ মনের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা ঢেউ খেলতে লাগলো।

গাড়ী গম গম ক'রে ছুটছে। বাইরে শুক্লপক্ষের শীর্ণ চাঁদ কোথায় যেন অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। রাত কত ঠিক বোঝা যায় না। ছবি ঘুমিয়ে রয়েছে বিমুর কোলে অকাতরে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে। দ্রুতগতির দোলায় সমস্ত কামরাটা দুলছে।

বৃদ্ধ লোকটি হাঁ ক'রে নিশ্বাস টানছিলেন। তাঁর জামায় বোতাম দেওয়া ছিল না, আর সেই ফাঁকে গোনা যাচ্ছিল তাঁর পাঁজরের হাড়

কথানা। হাত দুখানা গাছের মরা ডালের মতো শুকনো, আর নিষ্প্রাণ। পাশে ব'সে বর্ষীয়সী মহিলাটি, সম্ভবত তাঁর স্ত্রী—তাঁকে এতক্ষণ পরে কি যেন ঔষধ খাওয়ালেন। কতক্ষণ পরে ক্ষীণকণ্ঠে বৃদ্ধ কাছে ডাকলেন বিনুকে। বিনুর কোলে ছিল ছবি। তাকে নিয়ে সে হেঁট হয়ে বললে, কিছু বলবেন আমাকে ?

হ্যাঁ, বাবা।—ব'লে বৃদ্ধ চোখ খুললেন। পুনরায় বললেন, আমার আর দেরী নেই, বাবা।

কী বলছেন ?—বিনু চমকে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। পরে বললে, শরীর এত খারাপ, তবে গাড়ীতে উঠলেন কেন ?

আমি কাশী যাচ্ছি বাবা, অগস্ত্যকুণ্ডুতে থাকবো।—আর ওই—ওইটি আমার মেয়ে, আর নাৎনী।

বৃদ্ধ হাঁপাতে লাগলেন। বিনু বললে, আপনি বেশী কথা না বললেই ভালো হয়।

কিন্তু প্রাচীন বৃক্ষের কাঠ কিছু শক্ত। বৃদ্ধ একটু সামলে আবার আরম্ভ করলেন, আমার এক ছেলে গেছে যুদ্ধে, তা'র ঠিকানা জানিনে। আর এক ছেলে গেছে মারা। আর ওই মেয়েটি—

আচ্ছা, আচ্ছা—থাক্।—বিনু ব'লে উঠলো। বৃদ্ধ চোখ বুজে আবার কতক্ষণের জন্য নিঃসাড় হয়ে গেলেন। তাঁর অবস্থাটা এমনই ভয়াবহ দেখা যাচ্ছিল যে, রাতটা যেন নির্বিঘ্নে কাটলে হয়। গাড়ীর মধ্যে একটা শোচনীয় কিছু ঘটলে তা'র প্রতিকার করা সকলেরই সাধ্যের অতীত। বিনু এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেন হত-চকিত হ'য়ে উঠলো।

রোগী আবার একটু নড়লো। কিছু আশা দেখা দিল। বৃদ্ধ ক্ষীণতর কণ্ঠে বললেন, আবার আমার মেয়েটাকে নিয়ে ছ'মাস হোলো জামাইয়ের সঙ্গে মামলা। মামলায় দু'পক্ষই হেরে গেল, বাবা।

অলক্ষ্যে বিন্তু একবার তাকালো বৃদ্ধের কন্যার প্রতি। এতক্ষণ হ'লে তার জানা ছিল, মেয়েটি বিধবা। পরণে কালোপাড় শাড়ী, হাতে মাত্র দু'গাছি সরু রুলি,—সধবার অন্যান্য আভরণ সর্বাঙ্গে কোথাও কিছু নেই। এবার বোঝা গেল, ব্যাপারটা কিছু জটিল বটে।

আশ্বস্তকণ্ঠে বিন্তু প্রশ্ন করলো, আপনার কি অসুখ ?

বৃদ্ধ বললেন, পঁচাত্তর বছর বয়সে যে সব হয়, বাবা!—তা মেয়েটার আর কোনো গতি হোলো না, সঙ্গেই নিয়ে চললুম। মাসোহারা পেলে পাঁচ টাকা—বাস্, ওই পর্যন্ত।

বিন্তু বললে, আপনি আর কথা বলবেন না।

কথাটা বোধ হয় কানে গেল না। বৃদ্ধ মৃদু কণ্ঠে পুনরায় বললেন, জামাই চাকরি-বাকরি বেশ করছিল বাবা, কিন্তু একদিন সব ছেড়ে দিয়ে ছবি আঁকতে বসলো। ছবি আঁকে, সুতরাং খেতে পায় না! নিজে খেতে পায় না, তার ওপর এদের খাওয়াবে কি? বাবা কী অনাচারটাই করলো মেয়েটার ওপর! মার খেয়ে খেয়ে আমার মেয়েটার সর্বাঙ্গে কালশিরে প'ড়ে গেছে! চিল-কোঠার ঘরে বেঁধে রেখেছিল কতদিন, একটু জল পর্যন্ত খেতে দেয়নি!—যাক্, আর তা'র সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, বাবা! আমি বললুম, চল্ মোহিনী আমার সঙ্গে কাশীতেই চল্—মেগে পেতে যা হোক ক'রে তো'র দিন চলে যাবে। আর ওই ক্ষুদে মেয়েটা—আমার দুর্ভাগ্যের উপর ফাউ—ওটাকেও মানুষ করতে হবে।

বৃদ্ধ চুপ করলেন, তাঁর কণ্ঠের কাছে মহাপ্রাণী উঠে যেন ধুক্‌ধুক্ করতে লাগলো। হাতপাখাখানা তুলে নিয়ে বিন্তু তাঁকে বাতাস করতে করতে বললে, এবার আপনি দয়া ক'রে চুপ করুন।

ছবি তা'র কোলের মধ্যে অকাতরে ঘুমিয়ে রইলো—একরাশ ফুল যেমন প'ড়ে থাকে পুষ্পপাত্রে। তা'কে তুলে নিয়ে অন্যত্র শোয়াবার

লানো চেষ্টা দেখা গেল না। কেবল তাই নয়, বিনুর যে বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন, রাত্রির আহার যে তা'র সাঙ্গ হয়নি, তা'র প্রতি সামাজিক সৌজন্য প্রকাশেরও যে একটা আবশ্যক আছে—একথা মহিলাদের একটিবারও মনে হলো না। বরং ওই মুমূর্ষু রোগীর কাছাকাছি ব'সে—বিস্ময়ের কথা—তাঁদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখা গেল। অর্থাৎ সর্বপ্রকার দায়িত্ব এবং বোঝা বিনুর ওপর চাপিয়ে তাঁরা পরম নিশ্চিন্ত মনে ব'সে রইলেন। এটা যে স্বার্থপরতা, এটা যে অসঙ্গত আচরণ এবং অসাড় ও অশিক্ষিত মনের পরিচয়—এটুকু বিবেচনা করারও সজীব প্রাণশক্তি তাঁদের নেই।

ঘণ্টাকয়েক এইভাবে যাবার পর পরিশ্রান্ত বিনুর চোখে ঘুম এসেছিল, কিন্তু কি একটা স্টেশনে এসে গাড়ী থামতেই তা'র চোখ সজাগ হয়ে উঠলো। ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে লক্ষ্য করতেই এই প্রথম তা'র চোখে পড়লো ছবির মায়ের অর্থাৎ মোহিনীর তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখখানির দিকে। মুখের উপর থেকে ঘোমটা একটু খসে গেছে, কিন্তু সেই বন্ধ আয়ত চোখ দু'টি থেকে কখন নেমে এসেছে দুটি অশ্রুর ধারা। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বিনুর বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠলো। অসামাজিক, অকৃতজ্ঞ ব'লে বিনু এতক্ষণ মনে মনে যাকে লাঞ্ছিত করেছিল, তা'র সেই অনাবিষ্কৃত মুখখানি যে এমন—একথা বিনু কল্পনাও করেনি।

এক সময় সচেতন হ'য়ে সে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইলো তা'র কোলে ছবির মুখের দিকে। গাড়ীর দোলায় সে দুলতে লাগলো, অথবা আপন প্রাণের অসহ্য শিহরণে সে কাঁপতে লাগলো,—একথা বলা কঠিন। কেবল তা'র মনে এই কথাটাই ঘুরে ফিরে আসছিল, চাকরি-বাকরি ছেড়ে যে-লোকটা ছবি আঁকতে বসেছে, তা'র জীবনের মূল অনুপ্রেরণা কোথায়।

কয়েকদিন

সকাল আটটায় বেনারস ছাউনি স্টেশনে এসে গাড়ী থামলো। একরাত্রে বৃদ্ধের অবস্থা এমন খারাপ হয়েছে যে, তাঁকে তুলে ধরতে হোলো। মহিলারা আড়ষ্ট, অনভিজ্ঞ এবং জবুথবু। কে তাঁদের মালপত্রের হিসাব নেয়, কে তাঁদের সামলে গাড়ী থেকে নামায়, কেই বা তাঁদের বিলিব্যবস্থা ক'রে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়, তা'র কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তবু যেটি প্রথম প্রয়োজন—বৃদ্ধকে গাড়ী থেকে সযত্নে নামিয়ে দেওয়া—সেই কাজটি বিনু সম্পন্ন করলো। কুলীরা এসে এলোমেলো বিছানা আর আসবাবপত্র টানা-হেঁচড়া ক'রে প্লাটফরমে ছুঁড়ে ছুড়ে ফেললো। কোনোটা হারালো, কোনোটা ভাঙলো, কোনোটা বা তচনচ হলো। এমন নিরুপায়, অনভিজ্ঞ আর অভিভাবকহীন যাত্রীদল বিনুর আর কোনোদিন চোখে পড়েনি। এর ওপর ওঁরা কাশীতে এসেছেন এই প্রথম, সুতরাং পথঘাট কিছুই জানা নেই। সঙ্গে মৃতপ্রায় বৃদ্ধ, তাঁকে ধ'রে আছেন নিঃসহায় দু'টি মহিলা, আঁচল ধ'রে রয়েছে একটি অবোধ শিশু,—এতগুলি বেওয়ারিস মালপত্র—সমস্ত দৃশ্যটা লক্ষ্য ক'রে বিনু যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলো।

ট্রেন ছেড়ে দিল, বিনুকে নিয়ে গাড়ী চলতে লাগলো। অদূরে একদৃষ্টে তা'র দিকে দু'টি কচি চোখ মেলে ছবি দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে বললে, বাবু, তুমি এলে না আমাদের সঙ্গে? সেই আর্তস্বরের পর একটি পলক মাত্র। তারপরেই নিজের ব্যাগ আর বিছানাটা কোনোমতে টেনে নিয়ে বিনু চক্ষের নিমিষে গাড়ীর দরজা থেকে প্লাটফরমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দৃশ্যটা আতঙ্কজনক, চারিদিকে হৈ হৈ রব উঠলো। কিন্তু তার পরেই দেখা গেল, ওলোটপালট খেয়ে শ্রীমান্ বিনু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

অতঃপর এগিয়ে এসে ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বললে, আপনাদের

খুব অসুবিধে দেখতে পাচ্ছি, তাই নেমে পড়লুম। আপনাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে পরের ট্রেনেই লক্ষ্ণৌ রওনা হবো।

কোনো অভ্যর্থনা নেই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নেই—কেবল মৃতপ্রায় বৃদ্ধ ও তাঁর সঙ্গে মালপত্রগুলি বিনুর হেপাজতে ছেড়ে দিয়ে মহিলা দু'টি—মা ও মেয়ে—মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। এমন সময় ছবি তা'র শার্টের খুঁট ধ'রে ব'লে উঠলো, বাবু, আমি আর হাঁটতে পারি না।

তাই নাকি? এসো আমার কোলে।—এই ব'লে বিনু তাকে হাসিমুখে দুই হাতে তুলে নিল। অতঃপর তা'র হেপাজতে তিন জন কুলী মালপত্রগুলি মাথায় তুললো।

কিন্তু কয়েক পা যেতেই বৃদ্ধ এলিয়ে কাৎ হ'য়ে পড়লেন। বিনু দ্রুত ছবিকে কোল থেকে নামিয়ে বৃদ্ধকে ধ'রে ফেললো। রোগীকে দাঁড় করিয়ে রাখার সুযোগ আর এতটুকু নেই; অবস্থা বিবেচনা ক'রে বিনু তাঁকে একেবারে নিল কাঁধে। বৃদ্ধ বমি ক'রে ফেললেন তা'র জামার উপর। স্টেশনের লোকেরা চেঁচামেচি ক'রে বললে, আভি হাসপাতাল লে যাইয়ে, বাবুজি।

বিনু হিমসিম খেয়ে বুড়োকে কাঁধে ক'রে নিয়ে চললো গড়ান পাথর বাঁধানো পথটা পেরিয়ে। তারপর স্টেশনের বাইরে এসে কোনোমতে তাঁকে গাড়ীতে তোলা হোলো। তারপর মহিলাদের দিকে ফিরে বললে, আপনারা এঁকে নিয়ে এই গাড়ীতে থাকুন, আমি মালপত্র নিয়ে দুখানা এক্কায় আগে আগে যাচ্ছি।

এর পরে খুঁটিয়ে বলবার এমন কিছু দরকার নেই। অগস্ত্যকুণ্ডের বাসায় নিরাপদে তাঁদের তোলা হয়েছিল। বিনু পরের ট্রেনে চ'লে যাবে স্থির ছিল, কিন্তু বৃদ্ধের অবস্থা দেখে দুপুর বেলায় শহর খুঁজে খুঁজে

ডাক্তার আনতে বাধ্য হোলো। তা'র নিজের ডাক্তারীতে ভরসা পেলো না। ডাক্তার এসে রোগী দেখে ব'লে গেলেন, আশা কম।

এ অবস্থায় এই নিরুপায় পরিবারটিকে ফেলে যাওয়াটা কোন্ বিবেচনার পরিচয়? বিন্নুর যাওয়া হোলো না। ব্যাগ বিছানাটা এক পাশে ফেলে রেখে সে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়ে গেল। যে মৃতপ্রায় রোগী, সে মরবেই—কিন্তু যাদের সুস্থ শরীর, তাদের জীবনধারণের প্রয়োজন আছে। সুতরাং জল ও দুধের ব্যবস্থা, ঘুঁটে-কয়লা-কেরোসিন, বাজার-হাট, হাঁড়ি-কলসী, চাকরানি—এগুলোর ব্যবস্থাও বিন্নুকে অবিলম্বে ক'রে দিতে হোলো। মহিলারা ঘোমটার মধ্যে আবরুর তলায় চাপা রইলেন, আর বিন্নু বেকুবের মতো সারাদিন ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াতে লাগলো। রাস্তার এক দোকানে একটু চা খেয়ে গঙ্গায় গিয়ে জামা কাপড় সুদ্ধ সে ডুব দিল, তারপর উঠে সন্ধ্যে নাগাৎ এক হোটেলে গিয়ে আহার সাঙ্গ করলো।

ঘুম চোখে বাসায় ফেরবার আগে সে যা সন্দেহ করেছিল তাই ঘটলো। এসে দেখলো, আশেপাশের জন তিনচার স্ত্রী-পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছে—আর তাদের মাঝখানে মেঝের উপর বৃদ্ধের শবদেহ প'ড়ে রয়েছে। তাকে দেখে মহিলারা পাশের ঘরে গেলেন চাপা কান্না নিয়ে।

বিশ্রামের চিন্তা কোথায় অদৃশ্য হোলো। ছুটোছুটি ক'রে খাট কিনে এনে লোকজন ডেকে সকল ব্যবস্থা ক'রে বিন্নু যখন শবদেহটি তুলবে, রাত তখন ন'টা। ভিতর থেকে তখন একটা কথা এলো, ওঁর ইচ্ছে ছিল মণিকর্ণিকায় ওঁকে যেন দাহ করা হয়!

বিন্নু বললে, মণিকর্ণিকা যে অনেক দূর···এত রাত···হরিশ্চন্দ্র ঘাটে নিয়ে গেলে কি আপত্তি আছে?

ভিতর থেকে লোক মারফৎ জবাব এলো, না, মণিকর্ণিকাতেই দাহ করা চাই। সেখানেই নিয়ে যেতে হবে।

কুচ পরোয়া নেই, তাই হবে। —ব'লে বিন্নুরা শবদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে অন্ধকার রাতে পথে নামলো।

পরদিন বেলায় স্নান সেরে ফেরবার আগে বিন্নু স্থির করলো, বিপদ এবার কেটে গেছে, আজ যেমন ক'রেই হোক তা'কে রওনা হতে হবে। বিকালের গাড়ীতে সে যাবে, সুতরাং এখন আর কিছু নয়—একখানা নিরিবিলি ঘরে বিছানাটা ছড়িয়ে ঘণ্টা কয়েক ঘুমানো তার পক্ষে অবশ্য দরকার। ফেরবার আগে সে কিছু জলযোগ সেরে এসেছে,—অতএব বিছানাটা হাতে নিয়ে বিন্নু বাইরের একখানা অব্যবহৃত ঘরের দিকে চ'লে গেল। ভিতর মহলে শোকের কান্নাটা তুষের আগুনের মতো তখন ধিকি ধিকি জ্বলছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার মতো শরীর ও মনের অবস্থা বিন্নুর ছিল না।

বিকাল বেলায় সে উঠলো। জামা-কাপড় বদলে ব্যাগ বিছানা বেঁধে কুলী ডেকে এক্কা ভাড়া ক'রে যাবার জন্য সে যখন প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলো, তখন মজুরনি এসে সংবাদ দিল, খোকিকো বোখার আয়া···অপ্ মৎ যানা, বাবুজি—

কা'র জ্বর? ছবির?

হাঁ বাবু—বলে মজুরনি নিজের কাজে গেল।

গতকাল এ বাড়ীতে মৃত্যু ঘটেছে, সেই শোকের ছায়ায় এই আলোবায়ুহীন বাড়ীটি এখনো আচ্ছন্ন। মহিলারা যতই অসামাজিক হোক, মাথার উপর অভিভাবক তাঁদের কেউ নেই। কাশী তাঁদের পক্ষে নতুন, রাস্তাঘাট দোকান-বাজার তাঁদের পক্ষে অচেনা; ডাক্তার-বৈদ্যের ঠিক-ঠিকানা কিছুই তাঁদের জানা নেই। বিপদ ঘটলে সামনে এসে কেউ দাঁড়াবে এমন সম্ভাবনা একেবারেই কম। এ অবস্থায় জেনে শুনে

বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হ'য়ে এঁদের এই অকূলে ফেলে যাওয়া সমীচীন কিনা, বিনু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে একবার ভাবলো। ওদিকে তা'র জন্তে কলকাতা ও লক্ষৌ তোলপাড় হচ্ছে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে কোথায় গেল, ট্রেন তাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেললো,—এতক্ষণেও তা'র খোঁজ কেউ পায় নি। সেদিকে সকলেই দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন। এদিকেও তা'র হৃদয়ের সুর কোথাও কিছু নেই। পথের আলাপ পথেই শেষ হয়ে গেছে। যে-লোকটা আলাপ করেছিল সে আর জীবিত নেই। যে-বালিকার সঙ্গে তা'র বন্ধুত্ব ঘটেছিল সেও আর কাছে আসে না। তা ছাড়া সত্য বলতে কি, ভদ্র ব্যবহার সে এঁদের কাছে একটুও পায়নি। সে একটা মানুষ, তা'র ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, ক্লান্তি আছে, শারীরিক কল্যাণের কথা আছে—একথা মহিলারা গ্রাহ্য করেন নি। এমন কি, একথা প্রকাশ করতে তা'র কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই—তাঁদের এই দুর্দিনের ইতিহাস বিনুর প্রতি একটা অখণ্ড স্বার্থপরতা আর অবিবেচনায় ভরা। সুতরাং তাঁদের হিতাহিতের জন্য এই অন্ধকূপে আবদ্ধ হ'য়ে থাকা কোনো যুক্তিশাস্ত্রেই লেখে না। অতএব বিনু স্থির করলো, এখনই সে চ'লে যাবে। তবে যাবার আগে তার কর্তব্য, ছবিকে একবার দেখে যাওয়া।

গলার সাড়া দিয়ে জুতোর শব্দ ক'রে এসে সে শোবার ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকলো, ছবি? ছবি সাড়া দিল, উঁ?

বিনু ভিতরে গিয়ে ছবির বিছানার পাশে বসলো। ছবি প্রশ্ন করলো, তুমি যাবেনা, বাবু? তুমি গেলে কিন্তু কাঁদবো আমি।

বিনু হাসিমুখে তা'র কপালে হাত দিয়ে দেখলো প্রবল জ্বর। হাত টিপে দেখলো, নাড়ি খুব চঞ্চল। ছবির সমস্ত চেহারাটা রাঙা হয়ে উঠেছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো, ঔষধপত্রের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। গলা বাড়িয়ে সে প্রশ্ন করলো, জ্বর কখন এসেছে?

কোনো উত্তর কেউ দিল না। রোগীর অন্যান্য উপসর্গের কথা সে জানতে চাইলো, কিন্তু তথাপি বাইরে সবাই নিরুত্তর। আজকাল সময় খারাপ—ঋতুপরিবর্তনের কাল। সুতরাং এই প্রবল জ্বর বেঁকে অন্যপথ ধরতে পারে, এই দুর্ভাবনাটা বিনুর প্রথমেই মনে এলো। এমন রোগীকে বিনা চিকিৎসায় উপেক্ষা ক'রে ফেলে যাওয়া কোনক্রমেই মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়। বিনু উভয়সঙ্কটে প'ড়ে গেল।

ছবি বললে, বাবু?

কেন ছবি?

আমি তোমার সঙ্গে যাবো। রেলগাড়ী চড়বো।

বিনু বললে, বেশ ত, রেলগাড়ী চড়বে, বেড়াতে যাবে—আগে ভালো হয়ে ওঠো?

আমি ত' ভালো হয়েছি। তুমি আমাকে কোলে নাও?

আচ্ছা নেবো, আগে আমি ঘুরে আসি?—এই ব'লে বিনু উঠে দাঁড়ালো।—আমি ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনি।

বিনু বেরিয়ে এলো। এ গাড়ীতে তা'র আর যাওয়া হোলো না। মালপত্রগুলো ঘরের মধ্যে আবার ফেলে সে ডাক্তারের উদ্দেশে চ'লে গেল।

সম্পূর্ণ চারিটি দিন বিনু ব'সে রইলো ছবিকে নিয়ে। ডাক্তার আর ওষুধ আনা, পথ্যের ব্যবস্থা, রোগীর তদ্বির তদারক, রাত্রি জাগা—এর ওপর আবার এই সংসারের সর্বপ্রকার বাজার হাট।—বিনু ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত। তার নিজের স্নান চলে গঙ্গায়, আহারাদি চলে পথেঘাটে। অনিয়মে আর বিশৃঙ্খলায় তা'র শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এসেছিল। এখান থেকে পালাতে না পারলে তা'র মুক্তি নেই।

মেয়েটা তা'কে ছাড়া আর কারো কাছে থাকতে চায় না। সে খাওয়াবে, তুলে ধ'রবে, ফল কেটে দেবে, গল্প ক'রবে, মন ভোলাবে—অন্য কেউ কাছে এলে ছবি বিরক্ত হয়। বিন্নু স্নানাহার করার জন্য বাইরে গেলে সে কান্না নেয়, ফিরে এসে তা'র গায়ে হাত রেখে বসলে তবেই সে শান্ত হয়। সুতরাং মা আর দিদিমা সারাদিনই দূরে দূরে থাকে। জ্বর ছাড়বে কবে, বিন্নুর জানা নেই—ডাক্তারও কিছু বলতে পারে না। জ্বর ছাড়বার পরেও কি তার মুক্তি? রোগীর সেবা-যত্ন, তদ্বির-তদারক—সমস্তই আছে। পথ্য পাওয়ার আগে অবধি এক পাও তা'র নড়লে চলবে না। কিন্তু সে কবে? বিন্নুর যেন মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল। এই অন্ধকূপ, এই অভিশপ্ত পরোপকার, এই প্রাণান্তকর স্বার্থত্যাগ—এর শেষ কোথায়?

সাত দিনের দিন সকালে ছবির জ্বর ছাড়লো। রোগীকে সুস্থ ক'রে সমস্ত রাত্রির অক্লান্ত জাগরণের পর একটুখানি ঘুমোবার জন্য শ্রান্ত শরীরে বিন্নু টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আজ যেন আশার ক্ষীণ রশ্মি তার চোখে পড়লো।

সবেমাত্র একটা চাদর পেতে গায়ে মুড়ি দিয়ে সে শুয়েছে এমন সময়ে বাইরে কে যেন শিকল নেড়ে ডাকলো। বিন্নু ইচ্ছে ক'রেই উঠলো না—কিন্তু মজুরনি গিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

কে যেন ভিতরে এলো। বোঝা গেল, পুরুষের গলার আওয়াজ, এবং পুরুষেরই পায়ের শব্দ। বিন্নু চুপ ক'রে কান পেতে রইলো। মিনিট দুই পরে ভিতর দিকে নারীকণ্ঠের কলরব শোনা গেল, তা'র সঙ্গে ছবির হাসির আওয়াজ। তারপরেই সব চুপ।

অত্যন্ত ক্লান্তি ছিল বলেই বিন্নুর চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছিল। আন্দাজ আধঘণ্টাখানেক পরে পুরুষের সহাস্য কণ্ঠস্বরে বিন্নুর তন্দ্রা ভেঙে গেল।

—তোমরা আমার বিরুদ্ধে গেলে মামলা করতে! আরে, স্বামী-স্ত্রীর মামলায় কোথাও হারজিত আছে? পুরুষকে জব্দ করা কখন সম্ভব?

নারীকণ্ঠ শোনা গেল, তুমি কেন রাগ করলে আমার ওপর? কেন ফিরে এলে না?

এই ত এসেছি, এবার হোলো ত? ছবির অসুখ শুনে আর কি দূরে থাকতে পারি?

গাড়ীতে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে ত? যাও, শিগগির স্নান ক'রে এসো। নিজের হাতে আজ তোমাকে বসিয়ে খাওয়াবো।

বিমু আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে উঠলো। মালপত্রগুলো সব বেঁধে নিল, কাপড় চোপড় পরলো। তারপর দুর্বল ও পরিশ্রান্ত দেহে ব্যাগ আর বিছানা নিয়ে চুপি চুপি সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ছোট বারান্দাটা পেরিয়ে যাবার আগে ভিতর দিকে একবার তার দৃষ্টিটা ছুটে গেল। অন্তরাল থেকে পলকের জন্য সে দেখলো, সদ্য স্নান ক'রে এসে এলো-চুলে দাঁড়িয়ে একখানা আয়না হাতে নিয়ে একটি তরুণী—মানে, মোহিনী—সিঁথিতে সিঁদুর পরছে, এমন সময় পিছন থেকে একটি সুদর্শন যুবক এসে তা'কে দুই হাতে আলিঙ্গন ক'রে ধরলো। দু'জনেরই হাসিমুখ।

বিমু তা'র ব্যাগ আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেল ভারবাহী পশুর মতো। পথ অনেক দূর। সারাদিন যেখানেই হোক তাকে কাটাতে হবে। সন্ধ্যার সময় ট্রেন।

একটা যন্ত্রণাদায়ক বন্ধন থেকে এবারে সে অবারিত মুক্তি পেয়ে বাঁচলো। কিন্তু তা'র দুই পায়ের চলায় মুক্তির আনন্দ, কিম্বা কোন প্রচ্ছন্ন বেদনা জড়ানো ছিল—এটা পরিষ্কার ক'রে জানা কঠিন। তা'র শূন্য মনে কেবল এই ক'দিনের ছবি চললো ভেসে।

মঙ্গল-শঙ্খ

একটি ছোট ঘরের ভিতর মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। সমস্ত বাড়ীটি আতঙ্কে আচ্ছন্ন। অন্তিমশয্যাটির দুই পাশে স্বামী আর স্ত্রী একটি রুগ্ন শিশুর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে।

'বাঁচবে না, না—কিছুতেই না; এ ছেলে বাঁচতে পারে না। মিলি, কথা বলছ না যে?'

স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকালো।

'তুমি কি ভাবছ বাঁচবে?'

'না।'—মিলির গলার আওয়াজ বুজে এলো কান্নায়।

রুগ্ন শিশুর মুখের উপর সুবিনয় ঝুঁকে পড়লো। প'ড়ে রইলো অনেকক্ষণ,—তার পর মুখ তুললো। বললে, 'তবে যে ডাক্তার ব'লে গেল, বাঁচতে পারে?'

মিলি বললে, 'ওরা ডাক্তার, তাই শেষ কথাটা বলে না।'

'মিছে ব'লে গেল?'

'মিছে না বললে আশ্বাস দেবে কে? ওরা আশাবাদী, তাই ডাক্তার। কে?'

'না, কেউ নয় মিলি, হাওয়ায় ন'ড়ে গেল দরজা। কী দেখছ অমন ক'রে—ওটা গাছের ছায়া মাথা দোলাচ্ছে!'

মিলি আর্তকণ্ঠে বললে, 'নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর ডাক্তাররা—তাই ওরা আশা দেয়।' —মুমূর্ষু পুত্রের কাছে সে মুখ নামিয়ে আনলো।

সুবিনয় বললে, 'ঘরে কেউ নেই, পৃথিবী জনহীন, ঘড়িটা থেমে গেছে! তুমি কি বিশ্বাস করো মিলি, খোকার এই শেষ শয্যা?'

'আমি দেখতে পাচ্ছি।' —মিলি বললে, 'মরণকে চিনতে পারা সকলের চেয়ে সহজ। যদি খোকা বাঁচে তবে অনিয়ম হবে, প্রলয় ঘটবে। আশা? না—না, মিথ্যায় আর ভুল্‌ব না।'

'বাঁচাও তুমি, ভগবান!'—সুবিনয়ের গলা ভেঙে গেল।

'চুপ—চুপ করো সুবিনয়।'—মিলি যেন সহসা জীবন্ত হয়ে উঠলো,—'বিপদে তাঁকে ডেকো না, স্বার্থের ডাকে তিনি সাড়া দেবেন এত ছোট তিনি নন্‌। কে—কে কাঁদে বাইরে দাঁড়িয়ে?'

'ঝরাপাতার শব্দ, মিলি!'

'তাই হোক। আমি এর মা—মিথ্যে যেন সত্য না হয়। এর বাঁচাটাই হবে অস্বাভাবিক! বিশ্বের কোনো আইন, কোনো রহস্যই একে বাঁচাতে পারবে না, সুবিনয়।'

'ওই যে—ওই যে—' সুবিনয় পুনরায় বললে, 'যেন চোখ একটু খুলছে?'

'এইবার বন্ধ হবে শেষবার, আর খুলবে না। কালো হয়ে এলো মুখ, সবুজ হয়ে এলো ঠোঁট।'

'তবে কি এই শেষ?'

'এখনো কিছু আছে, কিছু জীবনের সঙ্গে কিছু মরণ! সুবিনয়, এবার প্রস্তুত হও তুমি?'

সুবিনয় অন্যদিকে তাকালো। সবগুলো জানলাই খোলা, দু'টো দরজা দিয়ে আসছে শীতের দুপুরের রৌদ্র-জড়ানো স্নিগ্ধ মধুর বাতাস। পশ্চিম দেশের ঢেউ-খেলানো মাঠের পারে অরণ্যময় পার্বত্য উপত্যকা। সুবিনয় অনেকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে করুণকণ্ঠে বললে, 'তুমিও প্রস্তুত হও মিলি, তুমিও ত এর মা!'

'তোমার গলার আওয়াজে কান্না কেন, সুবিনয়?'

'আমাদের বড় আদরের একমাত্র—'

'রুগ্ন, জন্মজীর্ণ, অকর্মণ্য।'—মিলি বললে, 'বেচারি!'

সুবিনয় বললে, 'বাঁচলেও এর পরমায়ু হোতো কম।'

'সেই ভয়! আমাদের আশা আর বিশ্বাসকে ফাঁকি দিতে ওর আবির্ভাব। আমাদের পথে বাধা দেওয়া,—আমাদের বিপন্ন করা,—আমরা ওর কী ক্ষতি করেছিলুম, সুবিনয়?'

'তাই ভাবি।'

'আমি ভাবিনে। ভাবি এবার নিষ্কৃতি পাবো, বাঁচবো, নিশ্চিন্ত হবো!'—মিলি বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেললো।

সুবিনয় বললে, 'তবু ত' বাঁচতেও পারতো, মিলি?'

'কিন্তু রুগ্ন হোতো। দুঃখ দিত আজীবন। পৃথিবী কি ভারাক্রান্ত হবে অসুস্থ প্রাণের বোঝায়? ক্লান্তি আর নিরানন্দ আর বিরক্তি,—না না, সুবিনয়, রুগ্নের ধ্বংস হোক, পৃথিবী সুন্দর হোক, সুস্থ হোক।'—মিলি ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললো।

'কিন্তু তুমি ওর মা, মিলি?'

'মা বলেই ত' ওর মুক্তি চাই, সুবিনয়! কী যে যন্ত্রণা মা হওয়ার, কী যে যন্ত্রণা রুগ্ন সন্তানের মুখের দিকে দিনের পর দিন চেয়ে থাকার,—তাই ত' কঠিন হয়ে প্রার্থনা করি, ও যাক্ সেই আনন্দলোকে; ফুটে উঠুক সেই মহাশূন্যে নক্ষত্র হয়ে, আমি কেবল হাত বাড়িয়ে থাকি সেই দুর্লভের দিকে।' মিলির কণ্ঠ কেঁপে উঠলো।

ব্যাকুল হয়ে সুবিনয় বললে, 'কেমন ক'রে বলো এমন কথা, তোমার গর্ভে কি ওর জন্ম নয়?'

মিলি বললে, 'আমার গর্ভে জন্ম, তাই ত' নেবো এই শাস্তি। সুবিনয়, তুমি আমাকে শক্তি দাও।'

'কিসের শক্তি মিলি ?'

'আমি যেন অনায়াসে সহ্য করতে পারি খোকার মৃত্যু। আমার চোখের জলে ওর অমৃতলোকের পথ যেন পিছল না হয়। ওর আনন্দে যেন পুত্রহারা মায়ের অসহ্য ব্যথা সুন্দর হয়ে ওঠে !'

সুবিনয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। মিলি মাথা তুলতে পারলো না, নত মস্তকে বলতে লাগলো, 'আমি—আমি কাঁদবো না সুবিনয়, এই নিষ্ঠুর বিচার আমি মেনে নেবো। কেন কাঁদবো ? সেবা আর যত্ন আর পরিশ্রমের ত্রুটি হয়নি, চিকিৎসায় ভুল হয়নি। হ্যাঁ, জানি মায়া মমতার দুশ্ছেদ্য বাঁধন। সুবিনয়, কোন্ আশায়, কিসের প্রত্যাশায় শ্রীহীন আর জন্ম-রুগ্ন সন্তানকে কোলে ধ'রে রাখবো ? অসীম বিরক্তি আর যন্ত্রণায় কি নিজের বাৎসল্যের গলা টিপে মারবো ? এইটেই কি হবে নিজের ওপর বড় বিচার ? কেন তুমি ওকে আনলে পৃথিবীতে ? কেন এই অপজনন ?'

রোগীর ডান হাতের কব্জিটি ধ'রে সুবিনয় যেন এক ভয়ঙ্কর মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছিল। মিলি সহসা বললে, 'ছেড়ে দাও !'

'ছাড়তে ইচ্ছে করে না, মিলি।'

'না, ছেড়ে দাও। ওকে নির্বিঘ্নে মরতে দাও, বেঁধে রেখো না।'

'দেখছি নাড়িটা—'

'আমি দেখছি ওর মুক্তি হবে কতক্ষণে—' মিলি শুষ্ক কঠিন কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'দীর্ঘ দিন ওকে ধ'রে রেখেছি, আর পারিনে। দেড় বছর ওর দিকে চেয়ে আছি, কিন্তু ও বিশ্বাসঘাতক। ও আমার সমস্ত উৎসাহকে নষ্ট করেছে, আমার সকল অধ্যবসায়কে জীর্ণ করেছে।'

'আর বোধ হয় দেরি নেই মিলি।'

মিলি একটা ঢোক গিলে মুখের একটা কেমন শব্দ করলো। মমতা

বৈরাগ্যের ঘাত-প্রতিঘাতশীল তরঙ্গে তা'র মাতৃহৃদয় আলোড়িত ছিল!

'ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, সুবিনয়!'

'কে?'

'ওরা।'

'ওরা কে, মিলি?'

'যারা এসে দাঁড়ায় অন্তিম মুহূর্তে।'

সুবিনয় বললে, 'ওঃ, আকাশটা কী গভীর কালো! রোদটা যেন ধোঁয়া। -আমি ওকে ধ'রে রাখবো!'

অশ্রু-কম্পিত-কণ্ঠে মিলি বললে, 'বাতাস নেই। পৃথিবীর হৃদ্‌পিণ্ডে যেন য়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, নিশ্বাস নিতে পারছে না। এখনি ভূমিকম্প হবে, র্বস্বান্ত হবে।'

'মিলি?'

'কেন, সুবিনয়?'

'আমি জানি তুমিও সর্বস্বান্ত হবে।'

মুমূর্ষু সন্তানের উপর প'ড়ে মিনি কেঁদে বললে, 'কী যে যন্ত্রণা!'

'তোমার মুখের, তোমার বুকের, তোমার বত্রিশ নাড়ির যন্ত্রণা!'

'মিলি?'

'কেন?'

'আর বোধ হয় দেরি নেই।'

'নেই? ভালো, খুব ভালো, আজ আমাদের মৃত্যু সাধনার সিদ্ধি, আজ থেকে অবারিত মুক্তি। সুবিনয়, কেন কাঁদবো বলতে পারো? জীবনে একটিবারও আমাকে মা বলেনি, আমি ওর দাসী, ধাত্রী,—তবু,

তবু কেন মায়া হবে আমার? কেন মমতা জন্মাবে দুর্বলের ওপর? কেন ধ'রে রাখবো চিররুগ্নকে?'

সুবিনয় বললে, 'তবে আমি আর কাঁদবো না, মিলি!'

মিলি বললে, 'পারবে সহ্য করতে?'

'যদি দুর্বল হই, তোমার কাছে শক্তি নেবো।'

'মনে হবে না যে সৃষ্টি ধ্বংস হোলো?'

'ওর মধ্যে ছিল ধ্বংসেরই বীজ, মৃত্যুরই বাসা। ও বাঁচলে আমার লজ্জা, আমার অপমান, আমার অখ্যাতি।'

'তবু ত তোমারই সন্তান, সুবিনয়? যদি তোমার চোখে জল আসে?'

সুবিনয় বললে, 'কই, আর ত ধুক্‌ধুক্ করছে না!'

মিলি ঝুঁকে প'ড়ে খোকাকে নিরীক্ষণ করলো। চোখের ভিতরে আর আলো নেই, সর্বাঙ্গে যেন শীতজর্জর সন্ধ্যা নেমে এসেছে,—পাণ্ডুর, মলিন। পুরাতন শিকড়ের মতো দেহটা শক্ত, জমাট।

'নেই?'

'না, নেই।'

মিলি বললে, 'কী বলছ?'

'বলছি, আমাদের খোকা নেই!'

'কষ্ট হচ্ছে তোমার?'

'না, একটুও না, নিজের লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি পেলুম!'

'আমিও, আমিও নিষ্কৃতি পেলুম দাসীবৃত্তি থেকে।'

'শাঁখ বাজাও মিলি! ওকি, তোমার মুখের বিকৃতি ঘটছে কেন?'

'কই, না?'—ব'লে মিলি উঠে দাঁড়ালো।

সুবিনয় খোকার মুখের উপর কাপড় ঢেকে দিয়ে বললে, 'শাঁখ বাজাও মিলি।'

মিলি শাঁখ এনে তার উপর মুখ রেখে বললে, 'ঠিক জানো, নেই?'

'জোরে শাঁখ বাজাও, খুব জোরে, যেমন বাজে ভূমিকম্পে, যেমন বাজে মঙ্গল অনুষ্ঠানে।'

মিলি শাঁখ বাজালো। হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন ভিন্ন ক'রে শাঁখ বাজালো। নীচে লোকজন অপেক্ষায় ছিল, তারা এলো। যথাকর্তব্যের পর তারা তুললো খোকাকে। খোকাকে শ্মশানে নিয়ে যাবে। মিলি বললে, 'এই নাও শাঁখ। তুমি—তুমিও যাও সঙ্গে, সুবিনয়।'

'একলা থাকবে তুমি?'

'একলা নয়। আমার খোকা আছে ঘর ভ'রে, বুক ভ'রে। আমার খোকা আছে আকাশ ভ'রে, দেশ জুড়ে। যাও তুমি শাঁখ বাজাতে বাজাতে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকবে, যেন দুর্বলের কোন চিহ্ন রেখে এসো না, যাও।'

মৃত শিশুকে সকলে নিয়ে গেল, সুবিনয় গেল সঙ্গে।

মৃত্যু যেন সমস্ত বাড়ীটার মালিন্য মুছে নিয়ে গেল। ঘরে হাওয়া ঢুকছে, আলো এসে পড়ছে। মিলি মুক্তি পেয়েছে, সুস্থ হয়ে বেঁচেছে। চেয়ে রইল সে পথের দিকে। মৃত্যুর পিছনে পিছনে চলেছে শঙ্খধ্বনি, কল্যাণ-রব। মিলি চেয়ে রইল দূরে প্রান্তর পর্বতের দিকে। পৃথিবী বিবর্ণ নয়। মাঠে মাঠে ফুল ধরেছে, সোনার শস্য জন্ম নিয়েছে শ্যামল প্রান্তরে, নূতন পাখীর দল এসেছে প্রাণের খাদ্যের সন্ধানে। আনন্দে মিলি বুক ভরে নিশ্বাস নিল। তার গর্ভে আবার নব-জীবনের সঞ্চার হয়েছে, নাড়িতে নাড়িতে তার নূতন আশ্বাসের সংবাদ প্রবাহিত হচ্ছে। আজ সে বাঁচলো, তীব্র নিষ্ঠুর ভাবে বাঁচলো।

অঙ্গার

বছর আষ্টেক হোলো দিল্লীতে আমি চাকরি করছি। কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক কম। কোনো কোনো বছরে কলকাতায় এক আধবার আসি, ঘুরে বেড়িয়ে সিনেমা দেখে আবার ফিরে চলে যাই। নৈলে, ইদানীং আর আসা হয়ে ওঠে না।

বছর তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে শোভনা আমাকে চিঠি লিখেছিল—ছোড়দাদা, তুমি নিশ্চয় শুনেছ আজ ছ'মাস হ'তে চললো আমার কপাল ভেঙেছে। ছেলেটাকে নিয়ে কিছু দিন শ্বশুর বাড়ীতে ছিলুম, কিন্তু সেখানেও আর থাকা চললো না। তোমার ভগ্নিপতি এক আধশো টাকা যা রেখে গিয়েছিলেন, তাও খরচ হয়ে গেল। আর দিন চলে না। তুমি আমার মামাতো ভাই হলেও তোমাকে চিরদিন সহোদর দাদার মতন দেখে এসেছি। ছেলেটাকে যেমন ক'রে হোক মানুষ ক'রে তুলতে না পারলে আমার আর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথাও থাকবে না। এদিকে যুদ্ধের জন্য সব জিনিসের দাম ভীষণ বেড়ে গেছে। হুটু পা ক'রে চাকরি খুঁজছে, এখনো কোথাও কিছু সুবিধে হয় নি। মা ভেবে আকুল। ইস্কুলের মাইনে দিতে না পারায় হারুর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। বাবার কোম্পানীর কাগজ ভেঙে সব খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি যদি এ অবস্থায় দয়া ক'রে মাসে মাসে দশটি টাকা দাও, তাহ'লে অনেকটা সাহায্য হতে পারে। ইতি—

দিল্লীতে আমার এই চাকরির খোঁজ প্রথম পিসেমশাই আমাকে দেন, সুতরাং শোভনার চিঠি পেয়ে স্বর্গত পিসেমশায়ের প্রতি আমার সেই

আন্তরিক কৃতজ্ঞতাটা হৃদয়াবেগের সঙ্গে ঘুলিয়ে উঠলো। সেই দিনই আমি পঁচিশটি টাকা পাঠিয়ে দিলুম এবং শোভনাকে জানালুম, তোর ছেলে যতদিন না উপার্জনক্ষম হয়, ততদিন প্রতি মাসে আমি তোর নামে পনেরো টাকা পাঠাবো।

সেই থেকে শোভনা, পিসিমা, মুটু, হারু—সকলের সঙ্গেই আমার চিঠিপত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পূজোর সময় এবং নতুন বছরের আরম্ভেও আমি কিছু কিছু টাকা তাদের দিতুম। তিন বছর এই ভাবেই চলে এসেছে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের কি-প্রকার অবস্থা দাঁড়িয়েছে, অথবা শোভনারা কিভাবে তাদের সংসার চালাচ্ছে, এর পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ-খবর আমি নিইনি, দরকারও হয়নি। মাঝখানে বোমার ভয়ে যখন কলকাতা থেকে বহু লোক মফঃস্বলের দিকে এখানে ওখানে পালিয়েছিল, সেই সময় শোভনার চিঠিতে কেবল জানতে পেরেছিলুম, ফরিদপুরে জিনিসপত্রের দর খুব বেড়ে গেছে। অনেক লোক এসেছে—ইত্যাদি। কিন্তু টাকা আমি নিয়মিত পাঠাই, নিয়মিত প্রাপ্তি স্বীকার এবং চিঠিপত্রও আসে। যা হোক এক রকম ক'রে শোভনাদের দিন কাটছে।

কিন্তু প্রায় ছ'মাস আগে মাসিক পনেরো টাকা পাঠাবার পর দিন-কয়েক বাদে টাকাটা দিল্লীতে ফেরৎ এলো। জানতে পারলুম ফরিদপুরের ঠিকানায় পিসিমারা কেউ নেই। কোথায় তা'রা গেছে, কোথায় আছে, কিছুই জানা যায়নি। চিঠি দিলুম, তার উত্তর পাওয়া গেল না। আর কিছুকাল পরে আবার মনি-অর্ডারে টাকা পাঠালুম, কিন্তু সে টাকাও যথাসময়ে ফেরৎ এলো। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ ক'রে গিয়েছিলুম। ভাবলুম, টাকার দরকার হ'লে তারা নিজেরাই লিখবে, আমার ঠিকানা ত' আর তাদের অজানা নয়।

কিন্তু আজ প্রায় তিন বছর পরে হঠাৎ কলকাতায় যাবার সুযোগ হোলো এই মাত্র সেদিন। আমাদের ডিপার্টমেণ্টের সাহেব যাচ্ছেন কলকাতায় তদ্বির-তদন্তের কাজে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। ভাবলুম, এই একটা সুযোগ। সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে কোনো একটা শনিবারে যাবো ফরিদপুরে, সোমবারটা নেবো ছুটি—দিন দুয়েকের মধ্যে দেখাশোনা করে ফিরবো। একটা কৌতূহল আমার প্রবল ছিল, যাদের বর্তমানে অথবা ভবিষ্যতে কোনো সংস্থান হবার কোন আশা নেই, সেই দরিদ্র পিসিমা আর শোভনা পনেরো টাকা মাসোহারার প্রতি এমন উদাসীন হোলো কেন? শুনেছিলুম, ফরিদপুর টাউনে ইতিমধ্যে কলেরা দেখা দিয়েছিল, তবে কি তাদের একজনও বেঁচে নেই? মনে কতকটা দুর্ভাবনা ছিল বৈ কি।

সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এলুম এবং এসে উঠলুম পাঁচগুণ খরচ দিয়ে এক হোটেলে। এসে দেখছি এই বিরাট মহানগর একদিকে হয়ে উঠেছে কাঙ্গালীপ্রধান ও আর একদিকে চলছে যুদ্ধ সাফল্যের প্রবল আয়োজন। ফলে, যারা অবস্থাপন্ন ছিল তারা হয়ে উঠেছে বহু টাকার মালিক, আর যারা গরীব গৃহস্থ ছিল, তা'রা হয়ে এসেছে সর্বস্বান্ত। দেশের সবাই বলছে, দুর্ভিক্ষ; গবর্ণমেণ্ট বলছেন, না, এ দুর্ভিক্ষ নয়, খাদ্যাভাব। দুটোর মধ্যে তফাৎ কতটুকু সে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে সপ্তাহখানেক ধরে আমার কর্তব্যস্রোতে গা ভাসিয়ে দিলুম। এর মধ্যে আর কোনোদিকে মন দিতে পারিনি। এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ছোট পিসির মেজ ছেলে টুনুর সঙ্গে একদিন শেয়ালদার বাজারের কাছে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতেই কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। একটা ফুলকাটা চটের থলেতে সের পাঁচেক চাল আর বাঁ-হাতে ডাঁটাশাক নিয়ে সে বিকেলের দিকে পথ পেরিয়ে যাচ্ছিল। দেখা হতেই সে থমকে দাঁড়ালো। বললুম, কিরে টুনু?

চমকে সে ওঠেনি, কিছুতেই বোধ হয় সে আর চমকায় না। কেবল তার অবসন্ন চোখ দুটো তুলে সে শান্তকণ্ঠে বললে, কবে এলে ছোড়দা ?

তার হাত ধরে বললুম, তোদের খবর কি রে ?

খবর ?—ব'লে সে পথের দিকে তাকালো। কসাইখানার মিলিটারি মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন গাভীর মতো দুটো নিরীহ তার চোখ; যেন এই শতাব্দীর অপমানের ভারে সে-চোখ আচ্ছন্ন। মুখ ফিরিয়ে বললে, খবর আর কি ? কিছু না।

হাসিমুখে বললুম, এ কি তোর চেহারা হয়েছে রে ? পঁচিশ বছর বয়স হয়নি, এরই মধ্যে যে বুড়ো হয়ে গেলি ?

আমার মুখের দিকে চেয়ে টুনু বললে, বাংলা দেশে থাকলে তুমিও হতে ছোড়দা—

কথাটায় অভিমান ছিল, ঈর্ষা ছিল, হতাশা ছিল। বললুম, চাল কিনলি বুঝি ?

টুনু বললে, না, আফিস থেকে পাই কন্‌ট্রোলের দামে। চারজন লোক, কিন্তু সপ্তাহে ছ'সেরের বেশী পাইনে। এই ত' যাবো, গেলে রান্না হবে। তোমার খবর ভালো, দেখতেই ত' পাচ্ছি। বেশ আছো।—আচ্ছা, চলি, যুদ্ধ থামবার পর যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।

বললুম, শোভনাদের খবর কিছু জানিস ? তারা কি ফরিদপুরে নেই ?

না—ব'লে একটু থেমে টুনু পুনরায় বললে, তাদের খবর আমার মুখ দিয়ে শুনতে চেয়োনা ছোড়দা !

কেন রে ? তারা থাকে কোথায় ?

বৌবাজারে, তিনশো তেরোর এক্ নম্বরে। হ্যাঁ, যেতে পারো বৈ কি একবার। আসি তা হ'লে—এই বলে টুনু আবার চললো নির্বোধ ও ভারবাহী পশুর মতো ক্লান্ত পায়ে।

টুনুর চোখে মুখে ও কণ্ঠস্বরে যেরকম নিরুৎসাহ লক্ষ্য করলুম, তাতে শোভনাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার রুচি চলে যায়। কলকাতায় এসে তারা যদি শহরতলীর আনাচে কানাচে কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো তাহ'লে একটা কথা ছিল। কিন্তু বৌবাজার অঞ্চলের বাসাভাড়াও ত' কম নয়। একটা কথা আমার প্রথমেই মনে হলো, মুটু হয়ত ভালো চাকরি পেয়েছে। আজকাল অন্ন দুর্লভ, চাকরি দুর্লভ নয়। যারা চির-নির্বোধ ছিল, তারা হঠাৎ চতুর হয়ে উঠলো এই সম্প্রতি। একশো টাকার বেশী মাসিক মাইনে পাবার কল্পনা যাদের চিরজীবনেও ছিল না, তারা যুদ্ধ সরবরাহের কনট্রাক্টে সহসা হয়ে উঠলো লক্ষপতি এবং দুর্ভিক্ষকালে চাউলের জুয়াখেলায় কেউ কেউ হোলো সহস্রপতি। হয়ত মুটুর মতো বালকও এই যুদ্ধকালীন জুয়ায় ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। এ যুদ্ধে কী না সম্ভব?

ওদের খবর নেবো কি নেবোনা, এই তোলাপাড়ায় আর কাজের চাপে কয়েকটা দিন আরো কেটে গেল। হঠাৎ আফিসের সাহেব জানালেন, আগামীকাল আমাদের দিল্লী রওনা হতে হবে। এখানকার কাজ ফুরিয়েছে।

আমারও এখানে থাকতে আর মন টিঁকছিল না। আমার হোটেলের নীচে সমস্ত রাত ধরে শত শত কাঙ্গালীর কান্না শুনে বিনিদ্র দুঃস্বপ্নে এই ক'টা দিন কোনমতে কাটিয়েছি—আর পারিনে। দুর্গন্ধে কলকাতা ভরা। তবু এখান থেকে যাবার আগে একবারটি পিসিমাদের খবর না নিয়ে যাওয়ার ভাবনায় মন খুঁৎ খুঁৎ করছিল। বিশেষ ক'রে যাবার আগের দিনটা ছুটি পেলুম জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য। একটা সুযোগও পাওয়া গেল।

বৌবাজারের ঠিকানা খুঁজে বা'র করতে আমার বিলম্ব হলো না। মনে করেছিলুম তারা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, হঠাৎ গিয়ে দাঁড়িয়ে

একটা চমক দেবো। কিন্তু বাড়ীটা দেখেই আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম। সামনে একটা গেঞ্জি বোনার ঘর, তার পাশে লোহার কারখানা, এদিকে মনিহারি দোকান, ভিতরে ভুষিমালের আড়ৎ। নীচেকার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, নীচের তলাটায় কতকগুলি লোক শোণদড়ির জাল বুনছে ক্ষিপ্রহস্তে। উপর তলাটায় লক্ষ্য ক'রে দেখি, বহু লোকজন। ওটা যে মেসবাসা, তা বুঝতে বিলম্ব হলো না। একবার সন্দেহক্রমে বাড়ীর নম্বরটা মিলিয়ে দেখলুম। না, ভুল আমার হয়নি—টুনুর দেওয়া এই নম্বরই ঠিক।

এদিক ওদিকে দুচারজনকে ধরে জিজ্ঞেস পড়া করতে গিয়ে যখন একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছি, দেখি সেই সময়ে বছর বারো তেরো বয়সের একটি মেয়ে সকৌতুকে উপর তলাকার সিঁড়ি বেয়ে মেসের দিকে যাচ্ছে এবং তাকে দেখে চার পাঁচটি লোক উপর থেকে নানারঙ্গে হাতছানি দিচ্ছে। আমি তাকে দেখেই চিনলুম, সে পিসিমার মেয়ে। তৎক্ষণাৎ ডাকলুম, মিনু ?

মিনু ফিরে তাকালো। বললুম, চিনতে পারিস আমাকে ?

না।

তোর মা কোথায় ?

ভেতরে।

বললুম, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ দেখি ? এ যে একেবারে গোলকধাঁধা ! আয় নেমে আয়।

মিনু নেমে এলো। বললে, কে আপনি ?

পোড়ারমুখি ! ব'লে তা'র হাত ধরলুম,—চল্ ভেতরে, তোর মা'র কাছে গিয়ে বলব, আমি কে ? মুখপুড়ি, আমাকে একেবারে ভুলেছিস ?

আমাকে দেখে উপর তলাকার লোকগুলি একটু স'রে দাঁড়ালো।

বেশ বুঝতে পাচ্ছিলুম, আমার হাতের মধ্যে মিনুর ছোট্ট হাতখানা অস্বস্তিতে অধীর হয়ে উঠেছে। উপরে উঠতে গিয়ে সে বাধা পেয়েছে, এটা তা'র ভালো লাগেনি। তা'র দিকে একবার চেয়ে আমি নিজেই তার হাতখানা ছেড়ে দিলুম। মিনু তখন বললে, ওই যে, চৌবাচ্চার পাশে গলির ভেতর দিয়ে সোজা চ'লে যান, ওদিকে সবাই আছে।

এই ব'লে সে উপরে উঠে গেল। চোখে মুখে তা'র কেমন যেন বন্য উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। এই সেদিনকার মিনু—পরণে একখানা পাৎলা সস্তা ডুরে, চেহারায় দারিদ্র্যের রুক্ষ শীর্ণতা—কিন্তু এরই মধ্যে তারুণ্যের চিহ্ন এসেছে তা'র সর্বাঙ্গে। তা'র অজ্ঞান চপলতার প্রতি ভীত চক্ষে তাকিয়ে আমি একটা বিষণ্ণ নিঃশ্বাস ফেলে ভিতর দিকে পা বাড়ালুম।

বিস্ময় চমক দেবার উৎসাহ আমার আর ছিল না। সরু একটা আনাগোনার পথ পেরিয়ে আমি ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, পিসিমা?

কে?—ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে সাড়া এলো এবং তখনই একটি স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ালো। বললে, কা'কে চান্?

অপরিচিত স্ত্রীলোক। রং কালো, নাকে নাকছাবি, মুখে পানের দাগ, পরণে নীল কাঁচের চুড়ি। এই প্রকার স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৌবাজারেই বেশী। বললুম, তুমি কে?—এই ব'লে অগ্রসর হলুম।

স্ত্রীলোকটি বললে, আমি এখানকার ভাড়াটে।

এমন সময় একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। দেখেই চিনলুম, সে হারু। হাসিমুখে বললুম, কি হারু, চিনতে পারিস? তোর মা কোথায়।

সে আমাকে চিনলো কিনা জানিনে, কিন্তু সহাস্যে বললে, ভেতরে আসুন। মা রাঁধছে।

অগ্রসর হয়ে বললুম, তোর দিদি কোথায়?

দিদি এখুনি আসবে, বাইরে গেছে। আসুন না আপনি?

বেলা বারোটা বেজে গেছে, কিন্তু এ বাড়ির বাসিপাট এখনো শেষ হয়নি। দারিদ্র্যের সঙ্গে অসভ্যতা আর অশিক্ষা মিলে ঘর দুয়ারের কেমন ইতর চেহারা দাঁড়ায়, এর আগে এমন ক'রে আর আমার চোখে পড়েনি। ছায়ামলিন দরিদ্র ঘর-দুখানার ভিজা দুর্গন্ধ নাকে এলো,—এ পাশে নর্দমা, ও পাশে কুৎসিত কলতলা। এক ধারে ঝাঁটা, ভাঙা হাঁড়ি, কয়লা আর পোড়া কাঠকুটোর ভিড়! ছেঁড়া চটের থলে টাঙিয়ে পায়খানা ও কলতলার মাঝখানে একটা আবরু রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। পিসিমাদের মতো শুদ্ধাচারিণী মহিলারা কেমন ক'রে এই নরককুণ্ডে এসে আশ্রয় নিলেন, এ আমার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য। একটা বিশ্রী অস্বস্তি যেন আমার ভিতর থেকে ঠেলে উপরে উঠে এলো।

রান্নার জায়গায় এসে পিসিমাকে পেলাম। সহসা সবিস্ময়ে দেখলাম, তিনি চটা-ওঠা একটা কলাইয়ের বাটি মুখের কাছে নিয়ে চা পান করছেন। আমাকে দেখে বললেন, একি, নলিনাক্ষ যে? কবে এলে?

কিন্তু আমি নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম তাঁর চা খাওয়া দেখে। পিসিমা হিন্দু ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা, স্নান আহ্নিক পূজা গঙ্গাস্নান, দান ধ্যান—এই সব নিয়ে চিরদিন তাঁকে একটা বড় সংসারের প্রতিপালিকার আসনে দেখে এসেছি। সদ্যস্নাতা গরদের থান পরা পিসিমাকে পূজা-অর্চনার পরিবেশের মধ্যে দেখে কতদিন মনে মনে প্রণাম ক'রে এসেছি। কিন্তু তিন বছরে তাঁর একি পরিবর্তন? আমিষ রান্নাঘরে ব'সে ভাঙা কলাইয়ের বাটিতে চা খাচ্ছেন তিনি?

বললুম, পিসিমা, প্রণাম করবো। পা ছুঁতে দেবেন?

পা বাড়িয়ে দিয়ে পিসিমা বললেন, কলকাতায় আমরা কমাস হোলো এসেছি, তোমাকে খবর দেওয়া হয়নি বটে। আর বাবা, আজকাল কে কা'র খবর রাখে বলো। চারিদিকে হাহাকার উঠেছে!

আমি একটু থতিয়ে বললুম, পিসিমা—আপনাদের মাসোহারার টাকা আমি নিয়মিতই পাঠাচ্ছিলুম···কিন্তু আজ ছ'মাস হ'তে চললো আপনাদের কোনো খোঁজ খবর নেই !

খবর আর আমরা কাউকে দিইনি, নলিনাক্ষ !

পিসিমার কণ্ঠস্বর কেমন যেন ঔদাসীন্য আর অবহেলায় ভরা। একদিন আমি তাঁর অতি স্নেহের পাত্র ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি যে আমার এখানে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে খুশী হননি, এ তাঁর মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারি।

হ্যাগা, দিদি—? বলতে বলতে সেই আগেকার স্ত্রীলোকটি হাসিমুখে চাতালের ধারে এসে দাঁড়ালো। পিসিমা মুখ তুললেন। সে পুনরায় বললে, তুমি বাজারে যাবে গা? বাজারে আজ এই এত বড় বড় টাট্‌কা-তপসে মাছ এসেছে—একেবারে ধড়ফড় করছে !

তা'র লালাসিক্ত রসনার দিকে তাকিয়ে পিসিমার মুখখানা কেম যেন বিবর্ণ হয়ে এলো। তিনি বললেন, তুমি এখন যাও, বিনোদবালা।

এমন উৎসাহজনক সংবাদে ঔৎসুক্য না দেখে ম্লানমুখে বিনোদবালা সেখান থেকে স'রে গেল। পিসিমা বললেন, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে, নলিনাক্ষ ?

বিশেষ কিছু না!—ব'লে আমি হাসলুম—আজকের দিনটা আপনাদের এখানে থাকবো ব'লেই আমি এসেছিলুম, পিসিমা।

তা বেশ ত', বেশ ত'—তবে কি জানো বাবা, খাওয়া দাওয়ার কষ্ট কিনা—বলতে বলতে পিসিমা চা খেয়ে বাটি সরিয়ে দিলেন। আমার থাকার কথায় তাঁর দিক থেকে কিছুমাত্র আনন্দ অথবা উৎসাহ দেখা গেল না।

বললুম, শোভনা কোথায়, পিসিমা ?

সে আসছে এখুনি, বোধহয় ও-বাড়ি গেছে।

ঈষৎ অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে আমি বললুম, সে কি আজকাল একলা বাসা থেকে বেরোয়?

পিসিমা বললেন, না, তেমন কই? তবে তেলটা, হুনটা, মধ্যে মাঝে দোকান থেকে আনে বৈকি। বিনোদবালা যায় সঙ্গে।

পিসিমা তাঁর কথার দায়িত্ব কিছু নিলেন না, কিন্তু কেমন একটা মনোবিকারে আমার মাথা হেঁট হয়ে এলো। বললুম, শোভনার ছেলেটি কোথায়? কত বড়টি হয়েছে।

পিসিমা বললেন, তা'র খুড়ো-জ্যাঠা আমাদের কাছে ছেলেটাকে রাখলো না, নলিনাক্ষ। তাদের ছেলে তা'রা নিয়ে গেছে।

সে কি পিসিমা, অতটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে? শোভনা পারবে থাকতে?

তা পারবে না কেন বলো? এক টাকায় দু'সের দুধও পাওয়া যায় না, ছেলেকে খাওয়াবে কি? নিজেদেরই হাঁড়ি চড়ে না কতদিন! অসুখ হ'লে ওষুধ নেই। শাড়ীর জোড়া বারো চোদ্দ টাকা। চা'ল পাওয়া যায় না বাজারে। আর কতদিন চোখ বুজে সহ্য করবো, নলিনাক্ষ? ভিক্ষে কি করিনি? করেছি। রাত্তিরে বেরিয়ে মান খুইয়ে হাত পেতেছি।—বলতে বলতে পিসিমা নিঃশ্বাস ফেললেন। পুনরায় বললেন, কই, কেউ আমাদের চা'ল ডালের খবর নেয়নি, নলিনাক্ষ!

অনেকটা যেন আর্তকণ্ঠে বললুম, পিসিমা, টুনুদেরও এই অবস্থা। সবাই মরতে বসেছে আজ, তাই কেউ কা'রো খবর নিতে পারে না। টুনুর কাছেই আপনাদের ঠিকানা পেলুম।

পিসিমা এতক্ষণ বসেছিলেন, অতটা লক্ষ্য করিনি। তিনি এবার উঠে দাঁড়াতেই তাঁর ছিন্নভিন্ন কাপড়খানার দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে

দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, এ বাড়ির ঠিকানা তুমি আর কাউকে দিয়ো না, বাবা।

এমন সময় মীনু এসে দরজার কাছে চঞ্চল হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললে, মা, মা শুনছ? এই নাও একটা আধুলি···হরিশবাবু দিল—

মীনুর মাথার চুল এলোমেলো, পরণের কাপড়খানা আলুথালু। মুখখানা রাঙা, গলার আওয়াজটা উত্তেজনায় কাঁপছে। অত্যন্ত অধীরভাবে পুনরায় সে বললে যোগীন মাস্টার বললে কি জানো মা, আজ রাত্তিরে গেলে সেও আট আনা দিতে পারে।

পিসিমা অলক্ষ্যে আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, বেরো—বেরো হারামজাদি এখান থেকে। ঝেঁটিয়ে মুখ ভেঙে দেবো তোর।

মীনু যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল। মায়ের মেজাজ দেখে মুখের কাছ থেকে স'রে গিয়ে সে অনুযোগ ক'রে কেবল বললে, তুমিই ত' বলেছিলে?

হারু ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, ফের মিছে কথা বলছিস, মীনু? এখন তোকে কে যেতে বলেছিল? মা তোকে রাত্তিরে যেতে বলেছিল না?

পিসিমা ব্যস্তভাবে বললেন, নলিনাক্ষ, তুমি বড্ড হঠাৎ এসে পড়েছ, বাবা। এখন ভারি আতান্তর, তুমি ঘরে গিয়ে বসো গে।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরে এসে তক্তার মলিন বিছানাটার ওপর বসলুম। গলার ভিতর থেকে কি যেন একটা বারম্বার ঠেলে উঠছিল, সেটার প্রকৃত স্বরূপটা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারবো না। আমি এই পরিবারে মানুষ, আমি এদেরই একজন, এই আত্মীয় পরিবারেই আমার জন্ম। অথচ আজ মনে হচ্ছে এখানে আমি নবাগত, অপরিচিত ও অনাহূত একটা

লোক। যারা আমার পিসিমা ছিল, ভগ্নী ছিল, যাদের চিরদিন আপনার জন ব'লে জেনে এসেছি—এরা তা'রা নয়, এরা বৌবাজারের বিনোদবালাদের সহবাসী, এরা সেই আগেকার সম্ভ্রান্ত পরিজনদের প্রেতমূর্তি!

মনে ছিল না জানালাটা খোলা। বৌবাজারের পথের একটা অংশ এখান থেকে চোখে পড়ে। সেখানে অসংখ্য যানবাহনের জটলা—ট্রাম, বাস, মোটর, গরুর গাড়ি আর মিলিটারী লরির চাকার আঁচড়ানির মধ্যে শোনা যাচ্ছে অগণ্য মৃত্যুপথযাত্রী দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের আর্তরব। জঞ্জালের বাল্‌তি ঘিরে ব'সে গেছে কাঙালীরা, পরিত্যক্ত শিশুর কঙ্কাল গোঙাচ্ছে মৃত্যুর আশায়, স্ত্রীলোকদের অনাবৃত মাতৃবক্ষ অন্তিম ক্ষুধার শেষ আবেদনের মতো পথের নালার ধারে প'ড়ে রয়েছে।

জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এদিকে মুখ ফিরাবো, এমন সময় শুনি হারু আর মীনুর কান্না—পিসিমা একখানা কাঠের চেলা নিয়ে তাদের হঠাৎ প্রহার করতে আরম্ভ করেছেন। উঠে গিয়ে বলবার ইচ্ছা হোলো, তাদের কোনো অপরাধ নেই—নিরপরাধকে অপরাধী ক'রে তোলার জন্য দিকে দিকে যেসব ষড়যন্ত্রের কারখানা তৈরী করা হয়েছে, ওরা সেই ফাঁদে পা দিয়েছে, এইমাত্র। কিন্তু উঠে বাইরে যাবার আগেই, বাইরে শোনা গেল কলকণ্ঠের সম্মিলিত খলখলে হাসি। সেই হাসি নিকটতর হয়ে এলো।

ঘরের কাছাকাছি আসতেই দেখি, বিনোদবালার সঙ্গে শোভনা। আমি তা'কে ডাকতেই সে যেন সহসা থাঁৎকে উঠলো। দরজার কাছে এসে শোভনা শিউরে উঠে বললে, একি, ছোড়দাদা? তুমি ঠিকানা পেলে কেমন ক'রে?

বললুম, এমনি এলুম সন্ধান ক'রে। কেমন আছিস তোরা শুনি।

নিজের চেহারা এতক্ষণে শোভনার নিজেরই চোখে পড়লো। জড়সড় হয়ে বললে, আমি আশা করিনি তুমি আমাদের ঠিকানা খুঁজে পাবে।

বললুম, কিন্তু আমাকে দেখে কই একটুও খুশী হলিনে ত?

শোভনা চুপ ক'রে রইলো। পুনরায় বললুম, এতদিন বাদে তোদের সঙ্গে দেখা। কত দেশ বেড়ালুম, দিল্লীতে কেমন ছিলুম—এইসব গল্প করার জন্যেই এলুম রে। তোর ছেলেকে পাঠিয়ে দিলি, থাকতে পারবি?

না পারলে চলবে কেন ছোড়দা?

এদিক ওদিক চেয়ে আমি বললুম, কিন্তু এ-বাড়িটা তেমন ভালো নয়, তোরা এখানে আছিস কেন শোভা?

এখানে আমাদের ভাড়া লাগে না।

সবিস্ময়ে বললুম, ভাড়া লাগে না? এমন দয়ালু কে রে?

শোভনা বললে, যাঁর বাড়ি সে ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে দয়া ক'রে থাকতে দিয়েছেন।

আজকালকার বাজারে এমন দয়া দুর্লভ!

শোভনা বললে, তাঁর কেউ নেই, একলা থাকেন কিনা তাই—

বোধহয় বিনোদবালা আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, সেই দিকে মুখ তুলে চেয়ে শোভনা সরে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে আবার সে যখন এসে দাঁড়ালো, দেখি পাতলা জালের মতন শাড়ীখানা ছেড়ে শোভনা একখানা সরু পাড় ধুতি প'রে এসেছে।

বললুম, শোভনা, তোরা ঠিকানা বদলালি, আমাকে চিঠি দিতে পারতিস!

ঠিকানা ইচ্ছে ক'রে দিইনি ছোড়দা!

কিন্তু মাসোহারার টাকা নেওয়া বন্ধ করলি কেন রে ?

একটু থতিয়ে শোভনা বললে, ছেলের জন্যেই নিতুম তোমার কাছে হাত পেতে। কিন্তু ছেলে ত' নেই, ছেলে আমার নয়, তাই নেওয়া বন্ধ করেছি !

প্রশ্ন করলুম, তোদের চলছে কেমন ক'রে ?

শোভনা বললে, তুমি আজ এসেছ, আজই চ'লে যাবে—তুমি সে কথা শুনতে চাও কেন ছোড়দা ?

চুপ ক'রে গেলুম। একথা শোনবার অধিকার আমার নেই, খুঁচিয়ে জানবারও দরকার নেই। বললুম, হুটু কোথায় ?

সে লোহার কারখানায় চাকরি করে, টাকা পঁচিশেক পায়। সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু চাল-ডাল আনে। আজকাল আবার নেশা করতে শিখেছে, সবদিন বাড়িও আসে না।

বললুম, সে কি, হুটু অমন চমৎকার ছেলে, সে এমন হয়েছে ? হারুর পড়াশুনোও ত' বন্ধ। ও কি করে এখন ?

শোভনা নত মুখে বললে, এই রাস্তার মোড়ে চায়ের দোকানে হারুর কাজ জুটেছিল, কিন্তু সেদিন কতকগুলো খাবার চুরি যাওয়ায় ওর কাজ গেছে। এখন ব'সেই থাকে।

স্বভাবতই এবার প্রশ্নটা এসে দাঁড়ালো শোভনার ওপর। কিন্তু আমি আড়ষ্ট হয়ে উঠলুম। কথা ঘুরিয়ে বললুম, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার ভালো লাগেনি, শোভা। মীনুটা এখন যাই হোক একটু বড় হয়েছে, ওকে যখন তখন বাইরে যেতে দেওয়া ভালো নয়। বাড়ীটায় নানা রকম লোক থাকে, বুঝিস ত।

বাইরে জুতোর মসমস শব্দ পাওয়া গেল। চেয়ে দেখলুম, আধ ময়লা জামাকাপড় পরা একটি লোক এক ঠোঙা খাবার হাতে নিয়ে ভিতরে এল।

মাথায় অল্প টাক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ—লোকটির বয়স বেশী নয়। চাতালের ওপর এসে দাঁড়িয়ে বললে, কই, বিনোদ কোথা গেলে ? এক ঘটি জল দাও আমার ঘরে। আরে কপাল, খাবারের ঠোঙা হাতে দেখলে আর রক্ষে নেই। নেড়ি কুকুরের মতন পেছনে পেছনে আসে মেয়ে পুরুষগুলো কেঁদে কেঁদে। ছোঁ মেরেই নেয় বুঝি হাত থেকে। পচা আমের খোসা নর্দমা থেকে তুলে চুষছে, দেখে এলুম গো। এই যে, এনেছ জলের ঘটি, দাও। এ-দুর্ভিক্ষে চারটি অবস্থা দেখলুম, বুঝলে বিনোদ ? আগে ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে, যদি দুটি চাল পাওয়া যায়। তারপর হোলো ভাঙা কলাইয়ের থাল, যদি চারটি ভাত কোথাও মেলে। তারপর হাতে নিল হাঁড়ি, যদি একটু ফ্যান কেউ দেয়। আর এখন, কেবল কান্না,—কোথাও কিছু পায় না! আরে পাবে কোত্থেকে—গেরস্থরা যে ভাত গুলে ফ্যান খাচ্ছে গো। যাই, দু'খানা কচুরি চিবিয়ে প'ড়ে থাকি। —বলতে বলতে লোকটি ভিতর দিকে চ'লে গেল।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য করে শোভনা বললে, উনি ছিলেন এখানকার কোন্ ইস্কুলের মাস্টার। এখন চাকরি নেই। রান্নাঘরের পাশে ওই চালাটায় থাকেন।

একলা থাকেন, না সপরিবারে ?

না। ওঁর সবাই ছিল, যখন উপার্জ্জন ছিল। তারপর বড় মেয়েটি কোথায় চলে যায়, স্ত্রী তা'র জন্যে আত্মহত্যা করেন। ছেলে দুটি আছে মামার বাড়ী। ছোড়দা, বলতে পারো আর কত দিন এমনি ক'রে বাঁচতে হবে ? এ যুদ্ধ কি কোন দিন থামবে না ?

উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত, সান্ত্বনা দেবারও কিছু ছিল না। চেয়ে দেখলুম শোভনার দিকে। চোখের নীচে তার কালো কালো দাগ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও বিবর্ণ, সরু সরু হাত দুখানা শির ওঠা, রক্তহীন ও

স্বাস্থ্যহীন মুখখানা। যেন যুদ্ধের দাগ তার সর্বাঙ্গে, যেন দেশজোড়া এই দুর্ভিক্ষের অপমানজনক চিহ্ন মুখেচোখে সে মেখে রয়েছে। তার কথায় ও কণ্ঠস্বরে কেমন যেন আত্মদ্রোহিতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম। সেদিনকার শান্ত ও চরিত্রবতী শোভনা—আমার ছোট বোন—আজ যেন অসন্তুষ্ট অগ্নিশিখার মতো লক্‌লকে হয়ে উঠেছে। আমার কোন সান্ত্বনা, কোন উপদেশ শোনবার জন্য সে আর প্রস্তুত নয়। কিন্তু আমার অপরিতৃপ্ত কৌতূহল আমাকে কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে দিল না। এক সময়ে বললুম, শোভা, এটা ত' মানিস, সামনে আমাদের চরম পরীক্ষার দিন। চারিদিকে এই ধ্বংসের চক্রান্তের মধ্যে আমাদের টিঁকে থাকতেই হবে। যেমন করেই হোক নিজেদের মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে—

মান-সম্ভ্রম ?—শোভনা যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো—কোথায় মান-সম্ভ্রম, ছোড়দা ? আগে বুকের আগুন নিয়ে ছিলুম সবাই, এবার পেটের আগুনে সবাই খাক্ হয়ে গেলুম ! কে বলেছে প্রাণের চেয়ে মান বড় ? কোন্ মিথ্যেবাদী রটিয়েছে, আমাদের বুক ফাটে ত' মুখ ফোটে না ? ছোড়দা, তুমি কি বলতে চাও, যদি তিল তিল করে না খেয়ে মরি, যদি পোড়া পেটের জ্বালায় ভগবানের দিকে মুখ খিঁচিয়ে আত্মহত্যা করি, যদি তোমার মা-বোনের উপবাসী বাসি মড়া ঘর থেকে মুদ্দোফরাসে টেনে বা'র করে, সেদিন কি তোমাদেরই মান-সম্ভ্রম বাঁচবে ? যারা আমাদের বাঁচতে দিলে না, যারা মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে আমাদের মারলে, যারা আমাদের বুকের রক্ত চুষে-চুষে খেলে, তাদেরই কি মান-সম্ভ্রম পৃথিবীর ভদ্রসমাজে কোথাও বাড়লো ? যাও, খোঁজ নাও, ছোড়দা, ঘরে-ঘরে গিয়ে। কাঙ্গালীদের কথা ছাড়ো, গেরস্থ বাড়ীতে ঢুকে দেখে এসো। কত মায়ের বত্রিশ নাড়ী জ্বলে-পুড়ে গেল দুটি ভাতের জন্যে, কত দিদিমা-পিসিমা-খুড়িমা-বোন-বৌদিদিরা আড়ালে বসে চোখের জল

ফেলছে একখানি কাপড়ের জন্যে। অন্ধকারে গামছা আর ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে কত মেয়ে-পুরুষের দিন কাটছে, জানো? বাসি আমানি নুন গুলে খেয়ে কত লাজুক মেয়ে প্রাণধারণ করছে, শুনেছ? মান-সম্ভ্রম! মান-সম্ভ্রম নিজের কাছেই কি রইলো কিছু, ছোড়দা?

সপ্রতিভ লজ্জাবতী নিরীহ শোভনাকে এতকাল দেখে এসেছি। তার এই মুখর উত্তেজনায় আমার যেন মাথা হেঁট হয়ে এলো। আমি বললুম, কিন্তু কনট্রোলের দোকানে অল্প দামে চাল-কাপড় এসব পাওয়া যাচ্ছে—তোমরা তার কোনো সুবিধে পাওনা?

শোভনা আমার মুখের দিকে একবার তাকালো। দেখতে দেখতে তা'র গলার ভিতর থেকে পচা ভাতের ফেনার মতো একপ্রকার রুগ্ন হাসি বমির বেগে উঠে এলো। শীর্ণ মুখখানা যেন প্রবল হাসির যন্ত্রণায় সহসা ফেটে উঠলো। শোভনা হা হা হা ক'রে হাসতে লাগলো। সে-হাসি বীভৎস, উন্মত্ত, নির্লজ্জ এবং অপমানজনকও বটে। আমার নির্বোধ কৌতূহল স্তব্ধ হয়ে গেল।

পিসিমার কাছে মার খেয়ে মীনু ও হারু এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। হঠাৎ তাদের দিকে চেয়ে শোভনা চেঁচিয়ে বললে, কেন, কাঁদছিস কেন, শুনি? দূর হয়ে যা সামনে থেকে—

বিনোদবালা যেন কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে গলা বাড়িয়ে বললে, দিদি, মাসি মেরেছে ওদের। ও-বাড়ীর হরিশবাবুর কাছ থেকে মীনু পয়সা এনেছিল কিনা—হারু কি যেন ব'লে ফেলেছিল তাই—

শোভনার মাথায় বোধ হয় আগুন ধ'রে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, মা? কেন তুমি ওদের মারলে শুনি?

পিসিমা কলতলার পাশ থেকে বললেন, মারবো না? কলঙ্কের কথা নিয়ে দুজনে বলাবলি করছিল, তাই বেদম মেরেছি। বেশ করেছি।

কিন্তু ওদের মেরে কলঙ্ক ঘোচাতে তুমি পারবে ?

পিসিমা চীৎকার ক'রে উঠলেন, ভারি লম্বা লম্বা কথা হয়েছে তোর, শোভা। এত গায়ের জ্বালা তোর কিসের লা ? দিনরাত কেন তোর এত ফোঁসফোঁসানি ? কপাল পোড়ালি তুই, মান খোয়ালি, সে কি আমার দোষ ? পেটের ছেলেমেয়েকে আমি মারবো, খুন করবো, যা খুশি তাই করবো—তুই বলবার কে ?

শোভনা গর্জন ক'রে বললে, পেটের মেয়েরা যে তোমার পেটে অন্ন যোগাচ্ছে, তার জন্যে লজ্জা নেই তোমার ? মেরে মেরে মীনুটার গায়ে দাগ করলে—তোমার কী আক্কেল ? একেই ত' ওর ওই চেহারা, এর পর ঘর খরচ চলবে কোত্থেকে ? লজ্জা নেই তোমার ?

তবে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙবো, শোভা—এই ব'লে পিসিমা এগিয়ে এলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, নলিনাক্ষ আছে তাই চুপ করে ছিলুম। বলি, ফরিদপুরের বাড়িতে ব'সে বিনোদবালার ঠিকানা কে জোগাড় ক'রেছিল ? গাড়িভাড়া কা'র কাছে নিয়েছিলি তুই ?

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে শোভনা বললে, তাহলে আমিও বলি ? মাস্টারকে কে এনে ঢুকিয়েছিল এই বাসায় ? হরিশ-যোগেনদের কাছে কে পাঠিয়েছিল মীনুকে ? আমাকে কেরাণীবাগানের বাসায় কে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল ? উত্তর দাও ? জবাব দাও ? হোটেলের পাঁউরুটি আর হাড়ের টুক্‌রো তুমি কুড়িয়ে আনতে বলোনি হারুকে ? ফুটু বাড়ি আসা ছাড়লো কার জন্যে ?

মুখ সামলে কথা বলিস, শোভা ?

এমন সময়ে বিনোদবালা মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ঝগড়া মিটাবার জন্য। মারমুখী মা ও মেয়ের এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য অধঃপতন দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

বললুম, পিসিমা, আপনি স্নান করতে যান। শোভা, তুই চুপ কর্, ভাই। এরকম অবস্থার জন্যে কা'র দোষ দিবি বল্? তোর, আমার, পিসিমার, হারু-মীনুর,—এমন কি ওই বিনোদবালা, মাস্টারমশাই, হরিশের দলেরও কোন দোষ নেই! কিন্তু অপরাধ যাদের, তা'রা আমাদের নাগালের বাইরে, শোভা! যাকগে, আমি এখন যাই, আবার এক সময়ে আসবো।

শোভনা কেঁদে বললে, আর তুমি এসো না ছোড়দা!

আমি একবার হাসবার চেষ্টা করলুম। বললুম, পাগল কোথাকার!

পিসিমা বললেন, এত গোলমালে তোমার কিছু খাওয়া হোলো না বাবা, নলিনাক্ষ। কিছু মনে ক'রো না।

বিনোদবালা বললে, চলো, ঢের হয়েছে! এবার নেয়ে-খেয়ে তৈরী হও দিকি? গলাবাজি করলে ত' আর পেট ভরবে না। পেটটা যাতে ভরে তার চেষ্টা করো। আমি কি আগে জানতুম তোমরা ভদ্দরলোকের ঘর, তাহলে এমন ঝকমারি কাজে হাত দিতুম না!

অপমানিত মুখে পলকের জন্য বিনোদবালার দিকে চোখ তুলে অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আমি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম। পাতালপুরীর সুড়ঙ্গ-লোকের কদর্য-কলুষ রুদ্ধশ্বাস থেকে মুক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালুম রাজপথের ওপর দিগন্ত জোড়া মুমূর্ষুর আর্তনাদের মধ্যে। এ বরং ভালো, এই অগণ্য ক্ষুধাতুরের কান্না চারিদিকে পরিব্যাপ্ত থাকলেও কেমন একটা দয়াহীন সকরুণ ঔদাসীন্যে এদের এড়ানো চলে। কিন্তু যেখানে চিত্ত-দারিদ্র্যের অশুচিতা, যেখানে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসীর মর্মান্তিক অন্তর্দাহ, যেখানে কেবল নিরুপায় দুর্নীতির গুহার মধ্যে ব'সে উৎপীড়িত মানবাত্মা অবমাননার অন্ন লেহন করছে, সেই সংহত বীভৎসতার চেহারা দেখলে আতঙ্কে গলা বুজে আসে।

কিন্তু এরা কে? সেই ফরিদপুরের ছোট বাড়িটিতে ফুলের চারা আর

হবে, শোভা। শোন্, কালকেই আমি দিল্লী যাবো, তাই তাড়াতাড়িতে তোদের জন্যে চারটি চাল-ডাল কিনে আনলুম—ওগুলো তুলে রাখ্।

চাল-ডাল এনেছ? দুর্বল শরীরের উত্তেজনায় শোভনা যেন শিউরে উঠলো। যেন ভাবী ক্ষুধাতৃপ্তির কল্পনায় কেমন একটা বিকৃত উগ্র ও অসহ্য উল্লাস তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কাঁপতে লাগলো। রুদ্ধশ্বাসে সে বললে, তুমি বাঁচালে—তুমি বাঁচালে, ছোড়দা! তোমার দেনা আমরা কোনদিন শোধ করতে পারবো না!—এই ব'লে আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে আমার চিরদিনকার আদরের ভগ্নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বললাম, ওর সঙ্গে নতুন জামা-কাপড়ের একটা পুঁটলি রয়েছে, ওটা আগে তুলে রাখ্, শোভা।

শোভনা আমাকে ছেড়ে দিয়ে কেরোসিনের ডিবেটা নিয়ে এসে খাদ্যসামগ্রীর কাছে দাঁড়িয়ে একবার সব দেখলো। তারপর অসীম তৃপ্তির সঙ্গে কাপড়ের বস্তাটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চৌকীর নীচে রেখে এলো। বললে, ছোড়দা, মনে আছে, কোরা জামা-কাপড় পরে লোকের সামনে এসে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে কী লজ্জার কথা ছিল? দোকান থেকে চাল-ডাল এলে লুকিয়ে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতুম—পাছে কেউ ভাবে, চাল কেনার আগে আমাদের বুঝি খাবার কিছু ছিল না! মনে আছে ছোড়দা?

হেসে বললাম, সব মনে আছে রে!

শোভনা করুণকণ্ঠে বললে, তুমি বলতে পারো ছোড়দা, এ দুর্ভিক্ষ কবে শেষ হবে? সবাই যে বলছে, নতুন ধান উঠলে আমাদের আর উপোস করতে হবে না?

তার আর্তকণ্ঠ শুনে আমি চুপ করে রইলুম। কারণ, সরকারী চাকর হলেও ভিতরের খবর আমার কিছুই জানা ছিল না। শোভনা পুনরায়

বললে, ফরিদপুরের সেই মস্ত মাঠ তোমার মনে আছে, ছোড়দা? ভাবো ত, সেই মাঠে আমনের সোনার শীষ পেকেছে, হাওয়ায় তারা ঢেউ খেলছে আনন্দে, মাঠে মাঠে চাষার দল গান গেয়ে কাটছে সেই ধান,—সেই লক্ষ্মীকে ভারে ভারে তারা ঘরে তুলে আনছে! মনে পড়ে?

শোভনার স্বপ্নময় দুটি চোখ হয়ত সেই সোনার বাঙলার মাঠে মাঠে একবার ঘুরে এলো, কিন্তু আমি কেরোসিন ডিবের আলোয় এই নরককুণ্ড ছাড়া আর কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। কেবল নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, মনে পড়ে বৈকি।

কিন্তু এ কি শুনছি ছোড়দা? শোভনা আমার মুখের দিকে আবার ফিরে তাকালো। সভয় চক্ষু তুলে সে পুনরায় বললে, গোছা গোছা কাগজ বিলিয়ে আবার নাকি ওরা শুষে নিয়ে যাবে সেই আমাদে[illegible] ভাঙা বুকের রক্ত? নবান্নর পর আবার নাকি ভরে যাবে আমা[illegible]র কাঙালীর কান্নায়? বলতে পারো, তুমি?

কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, সহসা বাইরে কা'র পায়ের শব্দ পেয়ে শোভনা সচকিত আতঙ্কে অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালো। তারপর কম্পিত অধীরকণ্ঠে সে বললে, ছোড়দা, এবার তুমি যাও, তোমার অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় ন'টা—আমার মনে ছিল না, নিশ্চয় ন'টা বেজেছে। এবার তুমি যাও ছোড়দা!

এগুলো তুলে রাখ্ আগে সবাই মিলে?

রাখবো, ঠিক রাখবো—একটি একটি চাল-ডালের দানা গুনে গুনে রাখবো—কিন্তু এবার তুমি যাও, ছোড়দা। আলো ধরছি···তুমি যাও, একটুও দেরী ক'রো না···লক্ষ্মীটি ছোড়দা···

শোভনা চঞ্চল অস্থির উদ্দাম হয়ে এসে আমাকে যখন একপ্রকার টেনে নিয়ে যাবে, সেই সময় একটি লোক চাল-ডালের বস্তার ওপর হোঁচট

খেয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। একেবারে গায়ের উপর এসে প'ড়ে বললে, ওঃ, নতুন লোক দেখছি। চাল-ডাল এনে একেবারে নগদ কারবার।

লোকটার পরণে একটা খাকি সার্ট, সর্বাঙ্গে কেমন একটা নেশার দুর্গন্ধ। আমি বললুম, কে তুমি?

আমি কারখানার ভূত, স্যার।—এই ব'লে হঠাৎ শোভনার একটা হাত ধরে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে বললে, এসো, কথা আছে।

কথা কিচ্ছু নেই, ছাড়ো। ব'লে শোভনা তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিল।

বটে!—লোকটি ভুরু বাঁকিয়ে বললে, আগাম একটা টাকা দিইনি কাল?

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা বললে, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে?

বাঃ—বেরিয়ে যাবো ব'লে বুঝি এলুম দেড় মাইল হেঁটে? বেশ কথা বলে পাগ্‌লি!

চীৎকার ক'রে শোভনা বললে, বেরোও বলছি শিগগির? চলে যাও—দূর হয়ে যাও ঘর থেকে—

লোকটা বোধ হয় তক্তাখানার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। হেসে বললে, আজ বুঝি আবার খেয়াল উঠলো?

শোভনা আর্তনাদ ক'রে উঠলো—ছোড়দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছ তুমি? এ অপমানের কি কোনো প্রতিকার নেই?······দাঁড়াও, আজ খুন করবো—বঁটিখানা······

বলতে বলতে ছুটে সে বেরুলো—রান্নাঘরের দিকে চললো। লোকটা এবার উঠে বাইরে এলো। বললে, মশাই, এই নিয়ে মেয়েটা আমাকে অনেকবারই খুন করতে এলো, বুঝলেন? আসলে মেয়েটা মন্দ নয়, কিন্তু ভারি খেয়ালী! তবে কি জানেন স্যার, আমরা হচ্ছি 'এসেন্‌সিয়াল সার্ভিসের' লোক, যুদ্ধের কারখানায় লোহা-লক্কড় নিয়ে কাজ করি—

য়েমানুষের মেজাজ-টেজাজ অত বুঝিনে! এসব জানে ওই 'আই-ই'
পি লোকগুলো, ওরা নানারকম ভাঁড়ামি করতে পারে!

এমন সময় উন্মাদিনীর মতন একখানা বঁটি হাতে নিয়ে শোভনা ছুটে
য়ে এলো। পিসিমা ধড়মড়িয়ে এলেন, হারু ছুটে এলো। লোকটি
কণ্ঠে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, আর খুন করতে হবে না, দেখছি আজ
লের ভূত চেপেছে ঘাড়ে। আচ্ছা—এই যাচ্ছি স'রে।

বিনোদবালা আর পিসিমা দৌড়ে এসে ধ'রে ফেললেন শোভনাকে।

লোকটি পুনরায় নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বললে, বেশ, সেই ভালো। বিনোদের
রইলুম এ-রাত্তিরটার মতন। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে আমাকে নিশ্চয়
ঘরে নিয়ো, নৈলে কিছুতেই আমার ঘুম হবে না, বলে রাখলুম।—
, বেশ, কাল না হয় আড়াই সের চাল'ই দেওয়া যাবে। আয়
, তোর ঘরে যাই। বলতে বলতে বিনোদের হাতখানা টেনে নিয়ে
দাকার লোকটা ইস্কুল-মাস্টারের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

াভনা সহসা আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে হাউ হাউ করে
লাগলো। বললে, কবে, কবে ছোড়দা, কবে এই রাক্ষুসে যুদ্ধ
তুমি ব'লে যাও। তুমি ব'লে যাও, কবে এই অপমানের শেষ
ামাদের মৃত্যুর আর কতদিন বাকি?

স্তে আস্তে আমি পা ছাড়িয়ে নিলুম। শোভনার হৃৎপিণ্ড থেকে
রক্ত উঠে এলো। বললে, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে যদি কেউ
াকে, তাদের ব'লো এ যুদ্ধ আমরা বাধাইনি, দুর্ভিক্ষ আমরা
আমরা পাপ করিনি, আমরা মরতে চাইনি।

ভনা কাঁদুক, সবাই কাঁদুক। আমি অসাড় ও অন্ধের মতো
হাতড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে এসে পথে নামলুম।